স্বপনবুড়োর ঝুলি

স্বপনবুড়ো

শ্রীগুরু লাইব্রেরী

০৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ক[illegible]তা-৬

প্রথম প্রকাশ : মহালয়া,
১৩৬৩

প্রকাশক
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি. এস-সি
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট
কলিকাতা ৬

মুদ্রক
শ্রীসোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রতিভা আর্ট প্রেস
১১৫এ, আমহার্স্ট স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
ও
অন্যান্য ছবি
শিল্পী—ধীরেন বল

ব্লক প্রস্তুত-কারক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এন্‌গ্রেভিং কোং
১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

ব্লক-মুদ্রণ
মোহন প্রেস
২, করিশ চার্চ লেন
কলিকাতা-৯

স্বপনবুড়োর নিবেদন

"স্বপনবুড়োর ঝুলি"র পরিকল্পনা করা হয়েছিল বেশ কিছু দিন আগে। শ্রীগুরু লাইব্রেরীর কর্ণধার, বিশিষ্ট সাহিত্য-রসিক শ্রীভুবন মজুমদারের আন্তরিক উৎসাহ ও সহযোগিতায় "ঝুলি" পূজোর ঠিক আগেই রূপলাভ করে প্রকাশিত হল। এই ঝুলির ভেতর দেশের ছেলেমেয়েরা অনেক কিছু মনের খোরাক পাবে বলে ভরসা রাখি। তেতো, ঝাল, টক, নোন্তা, মিষ্টি সব রকম খাদ্যেরই সমাবেশ করবার চেষ্টা করা হয়েছে এতে।

এই সঙ্কলনের কাজে আমি বহু তরুণ বন্ধুর সহযোগিতা লাভ করেছি। ডাঃ অজিতশঙ্কর দের ভাণ্ডারে আমার কয়েকটি হাসির গল্প ছিল। তিনি তার ছাপা কাহিনী প্রকাশের অনুমতি দিয়ে আমায় কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। ইউনাইটেড্ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়ার নিষ্ঠাবান কর্মী শ্রীনৃপেন পাল "স্বপনবুড়োর শুভেচ্ছা" গুলি আন্তরিকতার সঙ্গে সংগ্রহ করে দিয়েছেন। তাঁর সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য।

অনুজ-প্রতিম শিল্পী ধীরেন বল এই ঝুলির 'পরিচায়িকা' ও প্রচ্ছদপট এঁকে দিয়ে পুস্তকখানির গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার নিবেদনে ইতি টেনে দিচ্ছি—

মহালয়া,

ছোটদের পাততাড়ি, যুগান্তর

১৩৬৩।

বিনীত

স্বপনবুড়ো

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীমতী আশা দেবী

শ্রীকরকমলেষু

স্বপনবুড়োর ঝুলি

অদেখা-বাঁধন

বহুকাল পরে অমিয় পূজোর ছুটিতে দেশে এসেছে। ছেলে বেলায় এইখানকার পাঠশালাতেই প্রথম পাঠ নিয়েছে, তার পর দীর্ঘকাল ছিল কল্‌কাতায় মামার বাড়ি।

এখানকার পথ-ঘাট, গাছ-পালা, পশু-পাখি সকলের সংগেই তার মনের মিতালি। কোন পথটা ক' পা যাবার পর মোড় ঘুরেছে, মাঠের কোন ধারে কী গাছ, খালের ভেতর দিয়ে দিনে ক'খানা ক'রে নৌকো চলে, এ সব অমিয়র মুখস্থ। যে হিজল গাছের ছায়ায় ওদের বিকেল বেলায় বৈঠক বস্‌ত তার ডাল্‌পালায় আজ একটিও পাতা নেই। বুড়ো মানুষের ন্যাড়া মাথার মতোই সে আজ একেবারে রিক্ত। সেখানে আশ্রয় নিলে আজ এতটুকু ছায়া পাওয়া যাবে না!

বিকেল বেলার বৈঠকে যারা মিল্‌ত—তাদের কারো কারো সংগে ইতিমধ্যেই অমিয়র দেখা হয়েছে। পলানে নিজের জাত ব্যবসা ছুতোর-মিস্ত্রির কাজ স্নরু করে দিয়েছে। তার বাড়ি গিয়ে হাজির হতে পলানে কী খুশি! কোথায় বসাবে, কেমন করে খাতির করবে—বুঝে উঠতে পারে না—শুধু বোকার মতো ফ্যাল্‌-ফ্যাল্ করে এদিক-ওদিক তাকায়।

অমিয় তারই মধ্যে ভাঙা টুলটা টেনে নিয়ে বসল ওর কাছাকাছি।

স্বপনবুড়োর ঝুলি

আনন্দের আতিশয্যে পলানে চীৎকার করে বল্লে, মা কে এসেছে দেখ, এসো—

চ্যাঁচামেচি শুনে পলানের মাও বেরিয়ে এলো বাইরে। প্রথমটা অমিয়কে চিন্‌তে পারে নি। কেননা এরই মধ্যে ক্যাঙারুর মতো সে ঢ্যাঙা হয়ে উঠেছে। অচেনা লোক মনে করে মা মাথায় আঁচল তুলে দিতে যাচ্ছিল!

পলানে একগাল হেসে বল্লে, আরে, ওকে চিনতে পারলে না মা? আমাদের অমিয়। তোমার হাতের বাতাবি লেবু মাখা খেতে খুব ভালোবাস্‌ত! এইবার পলানের মাব মুখে হাসি দেখা গেল। বল্লে, ও! আমাদের অমিয়! কত বড়টি হয়ে গেছ বাবা, চিনতেই পারি নি। পলানের সংগে দিনরাত কত আসতে যেতে, যাহোক্ কিছু হাতে তুলে দিতে পারতাম। এখন তো তোমায় মুড়ির মোয়া আর নারকোলের নাড়ু হাত পেতে নিতে বলতে পারবো না।

অমিয় জবাব দিলে, কেন পারবে না মাসি? আমি যে তোমার হাতের নারকোলের নাড়ু আর বাতাবি লেবু মাখা খেতেই এসেছি।

শুনে পলানের মার আনন্দ ধরে না!

বল্ল, তাহলে তোমরা বোসো বাবা,—আমি একটা বাতাবি লেবু গাছ থেকে পেড়ে নিয়ে আসি।

পলানের সংগে অমিয় পুরোনো দিনের গল্প সুরু করে দিলে। ছেলেবেলায় পাঠশালায় যাদের সংগে পড়েছে—তাদের কি কখনো ভোলা যায়?

স্বপনবুড়োর ঝুলি

সুশান্ত বড় লোকের ছেলে, সে তার কাকার সংগে এলাহাবাদ চলে গেছে ; সেইখানকার ইস্কুলেই সে পড়াশুনা করে। সুশান্তর কাকা ওখানে খুব নামকরা উকিল।

বিশ্বাসদের বাড়ির বটুক নদীর ধারে বটগাছ-তলায় একটি পান-বিড়ি আর সোডা-লেমনেডের দোকান দিয়ে বসেছে। মিলিটারী আর কণ্ট্রাক্টারদের কৃপায় আয় তার মন্দ হয় না।

অমিয় বল্লে, একদিন বেড়াতে বেড়াতে নদীর ধারে গিয়েছিলাম। আমার বলে কিনা, বোস্ অমিয়—বিড়ি খা। বটুকটা দেখলাম ক্রমাগত পান আর বিড়ি ফুঁক্ছে। অথচ ওই ছিল আমাদের ক্লাসের সব চাইতে মরালিষ্ট্।

পলানে বল্লে, আরে ভাই, পয়সার মুখ দেখলে মরাল-টরাল আর কিছু থাকে না। তোর সংগে তবু বরং কথা বলেছে ; আমাদের দেখলে ত' চিন্‌তেই পারে না। মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়।

দেশে ফিরে এসে আর একটি বন্ধুর কথা তার প্রায়ই মনে হয়। তার সঙ্গে ছিল অমিয়র গলায় গলায় ভাব। প্রতি পরীক্ষায় অমিয় হ'ত প্রথম আর সে হ'ত দ্বিতীয়। ইংরাজী ক্লাশের মাষ্টার মশাই রসিকতা ক'রে তাদের ছুটির নাম দিয়েছিলেন—Two jewells of the class.

আব্দুলের কথাটা ভাবছিল অমিয়।

কিন্তু মুখ খুলে বল্‌তে সাহস পায় না।

সারাদেশ জুড়ে এমন একটা রেষারেষি আর অমিলের আবহাওয়া বইছে যে, ভালো কথা বলতে গেলেও লোকে তার মানে নিজের মনোমত করে উল্টে-পাল্টে বদ্‌লে নেয়।

স্বপনবুড়োর ঝুলি

অমিয় একবার মনে করলে, আব্দুলের কথাটা সরাসরি পলানেকে জিজ্ঞেস করে। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হয়, এমন জবাব হয়তো সে পাবে যা তার মন কোনোমতেই শুনতে রাজি নয়।

ইতিমধ্যে পলানের মা মুড়ির মোয়া, নারকোলের নাড়ু আর চিঁড়ে ভাজা এনে হাজির। বল্লে, আজ তোমায় বাতাবি লেবু খাওয়াতে পারলাম না বাবা। গাছে যা আছে, একেবারে ছোট ছোট, মুখে তেতো লাগ্‌বে। আছ ত এখন কদিন—আমার মাথার দিব্যি দেয়া রইলো, এসো আর একবার।

নারকোলের নাড়ুর বাটিটা নিজের কাছে টেনে নিয়ে অমিয় জবাব দিলে, আসব বৈকি মাসিমা! তুমি যে রকম লোভ দেখাচ্ছ, তাতে ত' রোজই আসতে ইচ্ছে করবে। কিন্তু পলানে নিশ্চয়ই মনে-মনে চট্‌বে যে তার খাবারে ভাগ বসাচ্ছি।

ছেলেবেলার অভ্যেস মতো অমিয়র মাথায় একটি চাঁটি মেরে পলানে বল্লে, যা-যা, মেলা বাজে বকিস নি! ভারী তো খেতে দেয়া হয়েছে তার মধ্যে আমি আবার চোখ দিতে যাবো। আর তাছাড়া মায়ের হাতের মোয়া ত আমি বারো-মাসই খাই। তোরা কল্‌কাতার সহরে কতরকম খাবার খাস্—আমার মায়ের হাতের মোয়া যে তোর ভালো লাগে এই আমাদের ভাগ্যি—

একটা নাড়ু মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে অমিয় জবাব দিলে, কী যে বলিস তার ঠিক নেই। ওরকম ক'রে বল্লে, মাসির নাড়ুর অপমান করা হয়।

স্বপনবুড়োর ঝুলি

পল্টানের মা ছুটির দিকে তাকিয়ে থাকে আর ভাবে ওরা বুঝি এখনো পাঠশালার ছোট ছেলেই আছে !

গোবিন্দর সংগেও দেখা হয় অমিয়র।

ছেলেবেলায় গোবিন্দর ছিল মাছ ধরার সখ। বিশেষ ক'রে সে মাছ ধরায় জুড়ি ছিল না গোবিন্দর। ওর পাল্লায় পড়ে অমিয়দের দলকে যে কত এঁদো-পুকুরে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে আর মশার কামড় খেয়ে হাত পা ফুলিয়ে ঘরে ফিরতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই !

সেই গোবিন্দও একেবারে বদ্‌লে গেছে।

পাশের গাঁয়ে জমিদারী সেরেস্তায় সে খাতা লেখে। ও যে লেখাপড়া সংক্রান্ত কোনো কাজ করে সেইটে বোঝাবার জন্যে ডান কানে সব সময় একটা ময়ূরের পাখার কলম গুঁজে রাখে। সময় নেই - ভারী ব্যস্ত—এই রকম একটা ভাব গোবিন্দর মুখে-চোখে লেগেই আছে।

সেই গোবিন্দর সংগে গাঁয়ের চার মাথার মোড়ে দেখা। এই বয়সেই গোবিন্দ গলায় একটা চাদর ঝুলিয়ে নিয়েছে।

অমিয় তার চেহারার রকম-সকম দেখে বল্লে, এ কীরে ? গোবিন্দ জবাব দিলে, তোরা বুঝ্‌তে পারবিনে ভাই। জমিদারী সেরেস্তার কাজ,...একটু ভারিক্কী না দেখালে চলে ?

...রপর আপন মনেই কলমটা হাতে ক'রে ঘুরিয়ে নিয়ে ...পিঠে গুঁজে রাখ্‌লে।

...য় ওর ধরণ দেখে হেসে ফেল্লে।

...ন্দ চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে, হাসলি যে বড় !

স্বপনবুড়োর ঝুলি

তোদের আর কী? সহরে থাকিস্—গায়ে ফু দিয়ে বেড়াস্। আমাদের মোটেই তা নয়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করতে হয়, বুঝ্লি?

অমিয় মুচকি হেসে বল্লে, সত্যি?

ব্যস্তবাগীশের মতো গোবিন্দ চলে যাচ্ছিল।

অমিয় পেছু ডেকে বল্লে, আয়, বোস না একটু এখানে।

দুজনে নিরিবিলি মখমলের মতো ঘাসের ওপর বসে পড়ল।

অমিয় শুধোলে, হ্যারে গোবিন্দ, এদ্দিন পরে দেশে ফিরে এলাম, আমায় মোটা-মোটা কৈ মাছ খাওয়াবি না?

কৈ মাছের নামে গোবিন্দর চোখ দুটো কল্‌কেয়-বসানো টিকের মতো জ্বলে উঠ্‌ল। বল্লে, ঠিক্ বলেছিস, কালকেষ্ট—কি বলিস্?

কিন্তু পর মুহূর্তেই তার সমস্ত উৎসাহ যেন একেবারে নিভে এলো! ফিস্ ফিস্ করে বল্লে, কি জানিস্, মাছ ধরতে গেলে দাদা বড় বকে। সেই তো আমায় জুলুম করে খাতা লিখতে পাঠিয়ে দিলে। তোরাই বল্‌না—এই কি আমার চাকরি করবার বয়স?

গোবিন্দর ব্যথা কোথায় অমিয় বেশ বুঝ্‌তে পারলে! জবাবে শুধু কইলে, আবার ছেলেবেলাকার দিনে ফিরে গেলে ত... যেরা হয়, নারে? ...মাদের

উৎসাহের সংগে নড়ে-চড়ে বসে গোবিন্দ বল্লে, ...নয়

একঘেয়ে খাতা লেখা আদ্দপেই আমার ভালো... অমি...লে, কী

আর মাঝে মাঝে নাকের ডগার ওপর চশমা ... গোপী...র নাড়ুর

আড় চোখে জিজ্ঞেস্ করে, নকল করা কদ্দূর হল? তখন কি মনে হয় জানিস্? কালির দোয়াত শুদ্ধু ছুঁড়ে মারি ওর ছুঁচোলো নাকের ওপর। কিন্তু ভাই সাহস হয় না, মাস গেলে ১৩/১০ করে পাই কিনা! সব দাদার হাতে তুলে দিতে হয়। দু' পয়সার চানাচুর পর্যন্ত খাবার যো নেই। এত কড়া হিসেব দাদার।

গোবিন্দ হয়তো অনর্গল আরো বকে চল্‌ত। কিন্তু হঠাৎ অমিয় জিজ্ঞেস করে বসল, আচ্ছা ভাই গোবিন্দ, আব্দুলের কোনো খবর রাখিস? তার সংগে দেখা-টেখা হয়?

গোবিন্দ চোখ পাকিয়ে জবাব দিলে, খবরদার, ওদের সংগে মিশতে যাসনে আর—অনেক বিপদ। তুই নতুন এসেছিস্ কিনা—খুব সাবধানে চল্‌বি। আচ্ছা, আজ তা হলে উঠি। মাইনে পেয়েছি কিনা! তাড়াতাড়ি বাড়ি না ফিরলে দাদা আবার বকাবকি সুরু করবে। তোকে যে কিছু খাওয়াবো—

গোবিন্দকে থামিয়ে দিয়ে অমিয় জবাব দিলে, নারে পাগ্‌লা, তোকে কিছু খাওয়াতে হবে না। যদি খেতে হয়ত' তোর বৌদির কাছ থেকে চেয়ে খাবো।

—তবেই খেয়েছিস! ভুরু উল্টে গোবিন্দ বল্লে। আমাকেই দশটা কথা না শুনিয়ে দুবেলা ভাত দেয় না! আর তুই ত' আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু! খবরদার! আমার বাড়ির দিকে কখনো পা বাড়াবি নে!

হেলতে দুলতে গদাই-লস্করী চালে গোবিন্দ নিজের বাড়ির দিকে চলে যায়।

স্বপনবুড়োর ঝুলি

অমিয়র যেন উঠতেই ইচ্ছে করে না। গাঁয়ের চৌমাথার মোড়ে সে চুপচাপ বসে থাকে।

পশ্চিম আকাশে একরাশ ফাগ ছড়িয়ে দিয়ে সূয্যিমামা পাটে বসেছে। সহরে এ ছবি দেখবার যো নেই। অমিয় অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ওই দিকে।

আব্দুলের কথাই থেকে থেকে ওর মনে পড়ে। ছেলেবেলায় যার সংগে এত মনের মিতালি হয়, বড় হলে কি সে সব ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়!

দেশের এই অঞ্চলটায় একেবারে থম্‌থমে ভাব। হিন্দু ছেলেরা মুসলমান ছেলেদের সংগে মেশে না—মুসলমানেরাও মেশে না হিন্দুদের সংগে। সেদিন ইস্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভায় 'বন্দে-মাতরম্' গান নিয়ে তো দুপক্ষে একেবারে রাম-রাবণের যুদ্ধ হয়ে গেল। এ সব কথা সে পলানের মুখে শুনেছে।

কৈ, ওদের ছেলেবেলায় ত' এমন রেষারেষি, মন-কষাকষি ছিল না! আর মুখ-দেখাদেখিও বন্ধ হয় নি!

অমিয় আর আব্দুলের নাম ইস্কুলের প্রত্যেকটি ছেলের মুখে মুখে ফিরত। পাশাপাশি তারা বসত। একদিন দুদিন নয়—পাঠশালার সারাটা জীবন।

সে যে এতদিন পর দেশে ফিরে এসেছে আব্দুল কি আর সে কথা শোনেনি? ওর মনে কি একবারও একথা জাগছে না যে ছুটে গিয়ে অমিয়র সংগে দেখা করে আসি? অন্যান্য বছর ত' আব্দুলই আগে ছুটে আসে—ধরে নিয়ে যায় ওদের বাড়িতে। আব্দুলের দিদি কত জামরুল খাইয়েছে ওকে! সে কথা কি

কখনো ভোলা যায় ? ওদের মোড়ল হয়তো বারণ করে দিয়েছে হিন্দু পাড়ায় আস্‌তে। যেমন নাকি পলানে ও গোবিন্দ ওকে বারণ করল ওর সংগে কথা কইতে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল, সেখানটা একেবারে রক্তাক্ত। ছোটবেলায় সে পাঁঠা কাটা দেখেছে। পশুটার হত্যাকাণ্ডের পর গোটা নাট-মণ্ডপ ঠিক এমনি রক্তে ভেসে যেতো। এই রক্তের নদী আজ আঙিনা ছেড়ে সারা দেশে বয়ে চলেছে। অমিয়র কেবলি মনে হতে লাগল, এই রক্তের নদী সাঁতরে আব্দুলের সংগে ওর দেখা হবে না ! ছেলেবেলায় যে মিতালির রাখী ওরা পরস্পরের হাতে বেঁধে দিয়েছিল—শোণিত-বন্যায় তার বাঁধন আল্‌গা হয়ে গেছে।

* * * *

গভীর রাত্রে কিসের একটা কোলাহলে অমিয়র ঘুম ভেঙে গেল।

নদীতে কি বান এসেছে ?

মনে হচ্ছে বহুদূর থেকে একটা প্লাবনের জলোচ্ছ্বাস ক্রমশ তাদের বাড়ির দিকে এগিয়ে আস্‌ছে।

স্বপ্ন না সত্যি ভালো ক'রে বোঝবার আগেই সে পাশ ফিরে শুয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

যখন ঘুম ভাঙলো, তখন আর অনুমানের অবকাশ নেই, তার ঘরের বেড়ায় আগুন জ্বলছে !

অমিয় লাফিয়ে উঠে ছুটে গিয়ে দরজার খিল খুলে বাইরে বেরুতে চেষ্টা করল, কিন্তু ওপাশে শিকল তুলে দেওয়া হয়েছে।

স্বপনবুড়োর ঝুলি

এখন উপায় !

বাঁশের শুকনো বেড়ায় আগুন—অতি সহজেই চারদিক থেকে ঘিরে ধরল। সেই উত্তাপ সহ্য করে অমিয় কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে ?

ধোঁয়ায় সমস্ত ঘর ভরে গেছে।

সে পাগলের মতো চারিদিকে ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগলো। দম বন্ধ হয়ে আসছে। কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়ায় ভাস্‌তে ভাস্‌তে অমিয় খাটের ওপর একেবারে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ল।

এমন সময় পেছন দিক থেকে কে যেন তাকে একটা কাঁথা দিয়ে জড়িয়ে ধরল ; তারপর ভাঙা বেড়ার একটা দিক দিয়ে কৌশলে তাকে বাইরে এনে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রাখলে।

অমিয়র তখন কথা বলবার মতো অবস্থা নয়। সেই জীবন্মৃত অবস্থাতেও সে বুঝতে পারলে যে, আব্দুল তাকে এই লেলিহান অগ্নিশিখার কবল থেকে রক্ষা করেছে।

অনেক কষ্টে মনের আর বুকের সমস্ত শক্তি দিয়ে সে চীৎকার ক'রে উঠল, আব্দুল ! তুই !

আব্দুল বল্লে, চুপ ! কথা বলিস নে অমিয়। ওরা জান্‌তে পারলে আমাদের তুজনের কেউ বাঁচবো না। আমি একটু আগেই খবর পেয়েছিলাম বলে তোকে কোনো রকমে ঘরের বার করে আন্‌তে পেরেছি। এক মিনিট পরে এলে কি কাণ্ড ঘটত—এক মাত্র খোদাই বলতে পারেন।

পদ্মবুড়োর ঝুলি

সেই ঝোপের আড়ালে আব্দুলের বাহু-বন্ধনে থেকে অমিয় দেখতে লাগলো লোকগুলোর পৈশাচিক কাণ্ড।

জিনিসপত্র তচনচ করে ঘরের বাইরে এনে পেট্রোল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে। যা ইচ্ছে দু হাতে লুট করছে—পাগলের মতো লাফাচ্ছে, ঘরে যা খাবার-দাবার ছিল—ফেলে-ছড়িয়ে, লুটে-পুটে নিয়ে খাচ্ছে।

আব্দুল ফিস্ ফিস্ ক'রে বল্লে, ওরা সরে না গেলে তোকে ভাই আমাদের বাড়ি নিয়ে যেতে পারব না! ভাগ্যিস্ তোদের বাড়িতে এই সময় আর কেউ ছিল না। দিদি ত' তোর জন্য কেঁদে কেটে অস্থির হয়ে আছে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অমিয় শুধোলে, হ্যাঁ রে আব্দুল, আমি যে দেশে এসেছি সে খবব পেয়েছিলি তুই ?

আব্দুল উৎসাহিত হয়ে জবাব দিলে, সেই দিনই ত' ঘোড়া-ওয়ালার কাছে শুন্‌লাম—যে তোর বিছানা আর বাক্স ব'য়ে নিয়ে এসেছিলো। কিন্তু আসবার একেবারে যো ছিলো না ভাই! বাইরে থেকে মোল্লার দল এসেছে। তাদের শাসানিতে সবাই একেবারে তটস্থ। তবে এই কথা তুই বিশ্বাস করিস অমিয় যে, গাঁয়ের কেউ তোদের ঘরে আগুন দেয় নি!

অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে অমিয় বল্লে, তবে এখন যে তুই বড় ছুটে এলি আমায় আগুন থেকে বাঁচাতে ?

আব্দুল একথার কোনো উত্তর দিলে না, শুধু অমিয়কে দিয়ে বুকের কাছে আরো চেপে ধরল। সেই দিকে

স্বপনবুড়োর ঝুলি

ঝিঁ-ঝিঁ পোকার একটানা সুরে দুটি কিশোর ঝোপের মধ্যে প্রহর গুনতে লাগল।

ভূত-প্রেতের তাণ্ডব থেমে গেছে।

আব্দুল যখন অমিয়কে নিয়ে তাদের বাড়িতে হাজির হল,—তখন শেষ-রাত্তিরের তারা নিঃসংগ সাক্ষীর মতো একা সারা আকাশটা পাহারা দিচ্ছে।

ভীরু মাটির প্রদীপটা হাওয়ায় কাঁপছে।

তাই হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আব্দুলের দিদি—ঠিক গোয়াল ঘরটার সাম্‌নে। ওরা শুধু দুটি ভাই-বোন। সংসারে আর কেউ নেই।

ভাই-বোন মিলে ধরাধরি করে অমিয়কে আব্দুলের ছেঁড়া-কাঁথার বিছানায় শুইয়ে দিলে।

দিদি বল্লে, কোনো ভয় নেই ভাই, আমরা বেঁচে থাকলে তুমিও বাঁচবে। আমার গরু বিইয়েছে, দুধ গরম করেই রেখেছি—ঢক্‌ ঢক্‌ ক'রে খানিকটা খেয়ে ফেলো দেখি।

সারারাত দিদি ঠায় অমিয়র শিয়রে বসে। দু' একটি জায়গা সামান্য পুড়ে গিয়েছিল, দিদি কি সব টোট্‌কা ওষুধ লাগিয়ে দিতেই জ্বলুনি একেবারে থেমে গেল। পাড়াগাঁয়ের টোট্‌কা ওষুধ সময়ে-সময়ে অদ্ভুত কাজ দেয় কিন্তু অনেক নাম্‌ করা ডাক্তার তার সন্ধান রাখে না।

শেষ রাত্তিরে পাখার হাওয়ায় অমিয় নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমিয়ে আন্‌তে মাত্র খোদ।

স্বপনবুড়োর ঝুলি

ভাই-বোনে ছুবার এসে উঁকি মেরে দেখে গেল, কিন্তু কেউ ওর ঘুম ভাঙালো না।

সারাদিন গেল, সন্ধ্যে উৎরে গেল—অমিয়কে কি কাল-ঘুমে পেয়েছে কে জানে!

রাত যতই বাড়তে লাগল ছুই ভাই বোনের মুখে ততই আশংকার ছায়া ফুটে উঠতে লাগলো।

আরো খানিকক্ষণ বাদে আব্দুল এসে বল্লে, এইমাত্র আমি গোফুর ভাইয়ের কাছে জানতে পারলাম—অমিয়ভাই যে আমাদের ঘরে আছে, তা ওরা কি ক'রে খোঁজ পেয়েছে। আজ রাত্রেই নাকি ওকে সবাই খতম করে ফেল্‌তে চায়!

শিউরে উঠল দিদি! বল্লে, বলিস কি! আমাদের প্রাণ দিয়েও অমিয় ভাইকে বাঁচাতে হবে।

আব্দুল বল্লে, কিন্তু দেহে আর মনে ও এমন একটা চোট্‌ পেয়েছে যে নির্জীবের মতো পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে। কি করে ওকে তুলি বল তো?

দিদি বল্লে, না-না—আমাদের মন শক্ত করতে হবে ভাই! ওকে তুল্‌তেই হবে—

হঠাৎ বাইরের দিকে কয়েকটা লোকের গোলমাল শোনা গেল।

দিদি বল্লে, আমি ওদের গিয়ে আটকাচ্ছি, তুই সব দিক রক্ষা কর—আব্দুল!

আর কথা বলবার ফুরসৎ হল না—দিদি দ্রুত পায়ে সেই দিকে চলে গেল।

স্বপনবুড়োর ঝুলি

একটা লোক এগিয়ে এসে বল্লে, তোমাদের বাড়িতে একটি ছেলেকে লুকিয়ে রেখেছো—ভালো চাও ত' বের করে দাও।

দিদি মনে মনে খোদার নাম স্মরণ করলে,—তারপর বল্লে,—আমাদের ঘরে ? কেউ নেই তো ! তোমরা বোধ করি ভুল খবর পেয়েছে।

ওদিকে আব্দুল অমিয়কে ঘুম থেকে তুলে পেছন দিককার দরজা খুলে বাড়ির বাইরে চলে এসেছে। বাড়ির বাইরেই খাল। সেখানে আব্দুলের ডিঙি-নৌকো বাঁধা।

দুজনে চুপ্‌চাপ গিয়ে নৌকোতে উঠ্‌ল। কারো মুখে কোনো কথা নেই। দড়ি বাঁধা ছিল একটা গাছের ডালের সংগে। সে বাঁধন খুলে দিলে।

স্রোতের টানে নৌকো এগিয়ে চল্লো। আব্দুল বল্লে, আমি আজ আর কোনো কথা ভাবিনে ভাই! তোর প্রাণটা আগে বাঁচাতে হবে। তোকে আগে গাঁওের ঘাটে পৌঁছে দিয়ে আমার অন্য কাজ। বুঝ্‌লি, মানুষগুলি একেবারে ক্ষেপে গেছে। নিজেদের ভালো-মন্দ বুঝতে চায় না। সুবিধেবাদীদের উস্কানিতে এই কাণ্ড। আচ্ছা তুই বল, লুটের মালে কেউ বড়লোক হতে পারে ? এক কথায় বাংলা দেশটাকে ওরা ফাঁক করে দিলে।

কী লাভ হবে ? যারা শোষণ করবার তারা চিরকালই গরীবের অন্ন মারবে। আমি তোকে বলে রাখছি অমিয় ভাই, এ ভাগাভাগি বেশি দিন চল্‌বে না। এই বাংলা দেশ তার ভাষা তার সাহিত্য তার বিজ্ঞান তার ধ্যানের ধন, একি ভাগাভাগি

করে ভাগ-বাঁটোয়ারা করা চলে মুড়ির মোয়ার মত? তা হলে আমরা এদ্দিন পাশাপাশি বসে কি লেখাপড়া শিখলাম?

আবার আমবা মিল্‌বো—পাশাপাশি—হাত-ধরাধরি ক'রে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবো—

অমিয়র মাথায় যেন ঝড় ব'য়ে যাচ্ছিল।

সে কোনো কথার জবাব দিলে না। অবাক্ হয়ে তাকিয়ে দেখলে, চাঁদের আলোতে আব্দুলের চোখের কোণে জল চিক্‌চিক্ করছে!

"শিশুরে বঞ্চিত করা জীবনের গুরু অপরাধ"

—চুপ—চুপ—চুপ্‌!

—কেউ টুঁ শব্দটি করোনো!

—কেন কি হয়েছে?

—বিদেশী বুঝি? এখনো শোননি?

—কি এমন বুক-ভাঙা, হাড়-কাঁপা খবর শুনি?

—রাজার সাঙ্ঘাতিক ব্যায়রাম! যাকে বলে রাজযক্ষ্মা: শিবের অসাধ্য ব্যাধি।

—কেন, রাজবৈদ্যি কি ঘুমুচ্ছে? 'নিদান' খুলে ভালো ভালো ওষুধ দিতে পারে না? রাজকোষ খোলা আছে, যত খুশি টাকা নিক্‌...বনের গাছ-গাছড়া তুলে অনেক ভালো-ভালো ওষুধ তৈরী হোক্‌। রাজা বেঁচে উঠ্‌বেন।

—তবে ব্যাপারটা খুলেই বলি শোনো। রাজার হয়েছে রাজযক্ষ্মা। রাজবৈদ্যি এলেন। হাত দেখলেন, নাড়ী টিপলেন, চোখের কোণ টেনে দেখলেন, বুকের ধড়ফড়ানি পরীক্ষা করলেন, পায়ের পাতা থেকে ব্রহ্মতালু পর্য্যন্ত তন্ন-তন্ন করে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পর্য্যবেক্ষণ করে ব্যবস্থা দিলেন যে, গরুর দুধ হচ্ছে একমাত্র ওষুধ, জলপান বারণ, শুধু গো-দুগ্ধে বেঁচে থাকতে হবে।

—বেশ ত! রাজার গোশালায় কি দুগ্ধবতী গাভীর কোনো

আছে? তিনি গরুর দুধে স্নান করুন, গরুর দুধ পান করুন, দুধে আচান—যা খুশি।

—তবে আর গেরোর কথা বলো কেন? রাজার পেটে দুধ সয়না, এক ঝিনুক খাইয়ে দিলে, দশ ঝিনুক বমি হয়ে পড়ে। রাণী কাঁদছেন, রাজকন্যা উপোস করে মন্দিরে পূজো দিয়েছেন, রাজপুত্র নিজের বুকের রক্ত দিয়ে মন্দিরের দেবীর পা ধুইয়ে দিয়েছেন, কিছুতেই কিছু হচ্ছে না! তাইত রাজ্যে আমোদ-প্রমোদ, ভোজ, বলি, সভা-সমিতি, কবিতা-পাঠ, চিত্র-অঙ্কন সব বন্ধ। কেউ টু শব্দটি করতে পারবে না—সেনাপতির শক্ত আদেশ!

সত্যি তাই!

যে পুরীতে অতি সকাল থেকে নহবৎ বাজ্‌তো, বন্দীরা বন্দনা গাইত, দুপুরবেলা রাজকুমারী নৃত্যশিক্ষা করতেন, সন্ধ্যায় কবিতার শ্লোকে রাজসভা মুখরিত হয়ে উঠত, মন্দিরে বাজত শত কাঁসর ঘণ্টা, গভীর রজনীতে শোনা যেত সেতারের মিঠে বাজনা···সব কিছু একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে! মনে হচ্ছে একটা অদেখা মাকড়সা যেন গোটা রাজপুরীর ওপর তার মায়াজাল বিছিয়ে দিয়েছে। তাই সঙ্গীত মূর্চ্ছিত, ভাষা নির্ব্বাক, সাহিত্য স্তব্ধ আর মন্দিরেব মন্ত্র ম্রিয়মান!

মন্ত্রি তার সাদা দীর্ঘ দাড়িতে হাত বুলিয়ে বল্লেন, রাজ কবি-রাজের ভরসায় আর মহারাজের চিকিৎসা ফেলে রাখতে পারিনে। লোক পাঠাবো ম্লেচ্ছ দেশে, যবন দেশে, সাগর পারে, হিমালয়ের নিভৃত-গুহায়। যে রাজার প্রাণ বাঁচিয়ে দিতে পারবে তাঁকে দেবতা জ্ঞানে আমরা পুজো করবো, রাজকোষ খুলে তাঁকে

পুরস্কার দেবো, তাঁর স্বর্ণমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠা করবো!

দলে দলে ঘোষক, মন্ত্রির এই ঘোষণা ঢ্যাঁড়া দিয়ে ফিরতে লাগলো—দেশে, বিদেশে, সাগর পারে, বনের অন্ধকারে, পাহাড়ে উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে, গিরি গহ্বরে, পাতালে, গগন-পথে—

বহু চিকিৎসক এসে রাজপুরীতে সমবেত হ'ল। তাদের সঙ্গে ওষুধ এলো ঘোড়ার পিঠে, উটের পিঠে, গাধার পিঠে, হাতীর পিঠে জাহাজে, নৌকোয় আর বিমানে। নানা দেশের ঔষধ রাখবার জন্য এক বিরাট চিকিৎসা-ভবন নির্ম্মান করা হ'ল। সেই ওষুধের উগ্রগন্ধে দেশের কাক, চিল, পোকা, মাকড় সব গেল মরে, জন্তু জানোয়ার পালিয়ে গেল দেশ ছেড়ে।

সাগরপারের চিকিৎসক বল্লেন, রাজাকে এক উঁচু-পাহাড়ের ওপর শুইয়ে রাখতে হবে। রোদ, বৃষ্টি সব তাঁর গায়ের ওপর দিয়ে যাবে, তবেই তিনি একেবারে ভালো হয়ে উঠবেন।

ম্লেচ্ছ দেশের চিকিৎসক বল্লেন, বন্য কুক্কুটের ক্বাথ তৈরী করে ছ'মাস খাওয়াতে হবে, তবে যদি রাজা ভালো হন। পাতালপুরীর চিকিৎসক বল্লেন, রাজাকে একলক্ষ সূচিকা-ভরণ করতে হবে, তবে যদি জীবনের আশা ফিরে আসে। গগন-পারের চিকিৎসক বিধান দিলেন যে, তাঁদের দেশের পুষ্পক-রথে চড়ে রাজাকে মেঘলোকে অবস্থান কবতে হবে। তারই ফলে রাজা রোগমুক্ত হবেন।

যবন দেশের চিকিৎসক বল্লেন, একশত ছাগলের সঙ্গে রাজাকে একবছর একই গৃহে বাস করতে হবে, তবে রাজার গলায় রক্ত পড়া বন্ধ হবে।

মন্ত্রির আদেশে ঘটা করে চিকিৎসা সুরু হ'ল। এক দেশের চিকিৎসা শেষ হয় ত' আর এক দেশের প্রথা সুরু হয়।

ফলে রাজার জীবনী-শক্তি যা-ও একটু ছিল, ধীরে ধীরে সেটাও কমে আস্‌তে লাগলো!

রাণীর রোদনে রাজপুরীর সোপান পিছল হয়ে উঠল, রাজ-কুমারীর দীর্ঘশ্বাসে রাজ্যের বাতাস ভারী হয়ে গেল, রাজকুমারের অস্থিরতায় সকলের চোখ থেকে ঘুম গেল পালিয়ে!

মন্ত্রি বিচলিত হয়ে উঠ্‌লেন। সেনাপতি তরবারী মুষ্টি বদ্ধ করে অকারণ বিনিদ্র রজনী যাপন করতে লাগলেন। কোটালের অমনোযোগিতার সুযোগ নিয়ে দেশে চুরি-ডাকাতি বেড়ে গেল। হঠাৎ একদিন শেষ রাত্রে মন্ত্রির ঘুম ভেঙে গেল। হিমালয়ের নিভৃত গুহায় যে দূত পাঠানো হয়েছিল সেখান থেকে ত' সে ফিরে আসেনি। সকাল বেলা রাজপুরীতে এসে মন্ত্রি দ্রুত অশ্বারোহী পাঠিয়ে দিলেন হিমালয়ের নিভৃত গুহার উদ্দেশ্যে।

দূত আর অশ্বারোহী হতাশ হয়ে ফিরে এলো। হিমালয়ের গুহার তপস্বী এ-রাজ্যে আসতে রাজি হননি। তিনি বলেছেন, রাজ্যে পাপ ঢুকেছে, তাই তিনি এ-রাজ্যে পদার্পণ করবেন না।

মন্ত্রি কাউকে কিছু না জানিয়ে ছদ্মবেশে একদিন হিমালয়ের নিভৃত গুহার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। এই রাজাকে তিনি নিজে হাতে মানুষ করেছেন, শিক্ষা দিয়েছেন, আর পাশে বসে রাজ্য পরিচালনা করেছেন। সেই পুত্রের অধিক রাজা......তাকে কি তিলে-তিলে মৃত্যুর পথে তিনি যেতে দেখতে পারেন?

মন্ত্রির মুখে সব কথা শুনে হিমালয়ের তপস্বী বল্লেন, আমি

তোমাদের রাজ্যে যেতে পারি, কিন্তু আমার পা ছুঁয়ে শপথ করতে হবে যে, আমার আদেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করবে।

মন্ত্রি তপস্বীর পাদ-স্পর্শ করে অঙ্গীকার করলেন। হিমালয়ের অন্ধকার গহ্বর থেকে বেরিয়ে এলেন ন্যাসী —উজ্জ্বল সূর্য্যালোকেব মাঝখানে।

মন্ত্রি বললেন, আপনাব জন্যে রাজবথ হিমালযেব সানুদেশে অপেক্ষা করছে, আপনি চলুন।

তপস্বী মৃদুহেসে জবাব দিলেন, আমাকে পদব্রজে যেতে হবে। আর তোমায় যেতে হবে আমার সঙ্গে—এই কমণ্ডলুতে অ গঙ্গাজল তাই বহন করে নিয়ে। বাজার জীবন বক্ষাব জন্যে মন্ত্রি সমস্ত কষ্ট সহ্য করতেই প্রস্তুত। কোনো আপত্তি না কবে, সারথিকে বিদায় দিয়ে দু'জনে অগ্রসর হলেন। একপক্ষ কাল রাত্রি-দিন হেঁটে তাঁরা দুজনে রাজপুরীতে এসে উপস্থিত হলেন।

তপস্বী বল্লেন, রাজাকে নিয়ে এক গোপন কক্ষে তাঁর চিকিৎসা আরম্ভ হবে ; শুধু মন্ত্রি সঙ্গে থাকতে পাববে।

গোটা রাজ্যে থম্‌থমে ভাব। কখন কি হয় কেউ বলতে পারে না। এর আগে সমস্ত চিকিৎসাই ব্যর্থ হয়েছে, তাই চিকিৎসার ওপব মহারাণীব আর কোনো বিশ্বাস নেই।

মনে হচ্ছে, সমগ্র রাজ্য বিপদের শেব দিনগুলি নীরবে গণনা করে চলেছে। কেউ কারো মুখের দিকে তাকাতে পারে না পাছে সত্যিকথা তাদের চোখে-মুখে ধরা পড়ে।

এমনি হতাশার মধ্যে সুরু হ'ল হিমালয়ের তপস্বীর চিকিৎসা। রাজপুরীর এক গোপন ঘর। সেখানে শয্যাগত রাজা, মন্ত্রি আর

তপস্বী। তপস্বী উদাত্ত কণ্ঠে কি মন্ত্র উচ্চারণ করলেন সেই মন্ত্রের ধ্বনি কক্ষের দেয়ালে প্রতিহত হয়ে রাজার কর্ণকুহরে প্রবেশ করতে লাগলো।

রাজা সম্মোহিত হয়ে পড়লেন। তারপর তপস্বী মন্ত্রির হাতের কমণ্ডলু থেকে পবিত্র গঙ্গাজল নিয়ে রাজার সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে দিলেন।

রাজা উদ্‌ভ্রান্তের মতো চোখ মেলে তাকালেন। তপস্বী গম্ভীর কণ্ঠে বল্‌লেন, রাজা, আজ থেকে বিশ বছর আগের কাহিনী কা[illegible]ণ করো।

রাজার ঠোঁটটি শুধু নড়ে উঠল। কিন্তু তিনি কোনো কথা বলতে পারলেন না।

তপস্বী বল্লেন, রাজা মন স্থির করো, আমার প্রশ্নের উত্তর [illegible]ও—

ক্ষীণকণ্ঠে রাজা উত্তর করলেন, বিশ বছর আগের কোনো থা আমার মনে পড়ছে না।

তপস্বী আবার মন্ত্র উচ্চারণ করে শুধোলেন, এইবার অতীতের পানে তাকাও দেখি রাজা—

চীৎকার করে উঠলেন রাজা, শুধু অন্ধকার।

তপস্বী বল্লেন, ওই অন্ধকারে আলো ফুটবে। তার ভেতর তুমি তোমার অতীতের পাপের চিত্র দেখতে পাবে রাজা!

রাজা এইবার শিউরে উঠলেন: অভিভূতের মতো বলতে লাগলেন—হ্যাঁ তপস্বী, আমি চিত্রের ভেতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছি ……আজ থেকে বিশ বছর আগে ঘোড়ায় চড়ে অসংখ্য সৈন্য নিয়ে

স্বপনবুড়োর ঝুলি

আমি এই দেশ আক্রমণ করলাম। গ্রামের পর গ্রাম বিধ্বস্ত করে চললাম। আমাব বিজয় পথে কেউ বাধা সৃষ্টি করতে পারলে না। হঠাৎ একি! একটি পাতার কুটীরের সামনে আমার ঘোড়া থমকে দাঁড়ালো।

তপস্বীর মুখ এইবাব উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ব্যাকুল হয়ে শুধোলেন, হ্যাঁ পাতাব কুটীব। সেই পাতার কুটিরে তুমি কি দেখতে পাচ্ছ রাজা?

—দেখতে পাচ্ছি, দুখিনী মা তাব একমাত্র ছেলেকে দুধ খাওয়াচ্ছে। তাব শেষ সম্বল বিক্রী করে খানিকটা গরুর দুধ জোগাড় করেছে। অনুনয় কবে সেই শিশুর মা বলছে, একটু অপেক্ষা করো রাজা, আমি আমাব দুধের বাছাকে দুধ খাইয়ে নি! দু'দিন বাছা কিছু খায়নি। তার পর এই পাতাব কুটীর আমি ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি। না হয় তুমি এই বনটা ঘুবে চলে যাও, তাতে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না রাজা।

তপস্বী জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তুমি কি করলে রাজা? রাজা উন্মাদের মতো চীৎকার করে উঠলেন, আমি? আমি মায়ের সে কথায় কান দিলাম না। রাজ্য-জয়ের নেশা আমায় তখন পেয়ে বসেছে। দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম সেই পাতার কুটীরের ভেতর দিয়ে। ঘোড়ার খুরে দুধের পাত্র দূরে ছিট্‌কে পড়ল—শিশুটি পায়েব চাপে বরণ করে নিল অকাল মৃত্যুকে—! আমি দেখতে পাচ্ছি—স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি! রক্তে রাঙা হয়ে গেল সেই পাতার কুটীর—তার ওপর দিয়ে আমার তেজী-ঘোড়া পথ করে নিয়ে রাজ্য-জয়ের নেশায় এগিয়ে চল্লো।—

তপস্বী তখন বল্লেন, রাজা, তাহলে তুমি বুঝতে পারছ, কি গুরু অপরাধ তুমি করেছ ? কোলের শিশুকে মা দুধপান করাতে যাচ্ছে, সেই দুধ ফেলে দিয়েছ ! শুধু তাই নয়, তোমার ঘোড়ার খুরে শিশুর মৃত্যু হয়েছে ! শিশুর রক্তপাত ও জীবন নাশ করেছ বলে তোমার হয়েছে রাজযক্ষ্মা ! আর শিশুকে দুধ থেকে বঞ্চিত করেছ বলে কিছুতেই তুমি দুধ পান করতে পারছো না ।

রাজা হাত জোড় করে বল্লেন, তপস্বী, আপনি আমাকে এই অভিশাপের হাত থেকে রক্ষা করুন, আমি আপনাকে রাজ্যখণ্ড পুরস্কার দেবো। এইবার উন্মাদের মতো হেসে উঠলেন তপস্বী, তুমি বাতুল রাজা ! আমায় তুমি রাজ্যের লোভ দেখাচ্ছ ! তুমি জানো, কত রাজার মুকুট আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে··· আমি সেদিকে চেয়েও দেখি না। তাইত হিমালয়ের নিভৃত-গুহায় শুধু ভগবানের নাম সম্বল করে বেঁচে আছি। তোমার মন্ত্রি পুণ্যাত্মা লোক, শুধু তার অনুরোধেই আমি গুহা ছেড়ে তোমার এই পাপ পুরীতে প্রবেশ করেছি। কিন্তু বেশীদিন আমি এখানে থাকতে পারবো না, আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

মন্ত্রি তখন তপস্বীর পায়ের ধূলো নিয়ে অনুনয় করে বল্লেন, হে সন্ন্যাসী, আপনি যখন দয়া করে আমার সঙ্গে এসেছেন, তখন রাজাকে শাপ-মুক্ত না করে কিছুতেই যেতে পারবেন না। আমি আপনার পা জড়িয়ে বসে থাকবো।

সন্ন্যাসীর ললাটে চিন্তারেখা দেখা গেল। খানিকক্ষণ তিনি কোনো কথাই বল্লেন না। দুটি মুখ করুণ ভাবে তার দিকে তাকিয়ে জীবন-মৃত্যুর দোলায় দুল্‌ছে।

স্বপনবুড়োর ঝুলি

তপস্বী ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বল্লেন, শোনো রাজা, তোমাকে এই রাজ্যের চৌমাথায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করতে হবে—"শিশুরে বঞ্চিত করা জীবনের গুরু অপরাধ।" একদিন নয়, দু'দিন নয় ক্রমাগত একমাস ধরে এই ঘোষণা তোমাকে করতে হবে। যদি কোনো প্রজা এসে তোমার অতীত জীবনের কথা শুনতে চায়, তবে সকলের সামনে সে কথা বলতে হবে।

ক্ষীণকণ্ঠে রাজা বল্লেন, কিন্তু সন্ন্যাসী, আমি রুগ্ন, শয্যাগত, চৌমাথার মোড়ে আমি যাবো কি করে? সন্ন্যাসী জবাব দিলেন, নিজের মনোবলই তোমায় সেখানে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করবে। মনে-মনে এই প্রতিজ্ঞা করো যে, আপন পাপের কাহিনী তুমি সবাইকে জানিয়ে ভগবানের অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে চাও। পায়ে জোর পাবে—হেঁটে চলে যেতে পারবে চৌমাথা অবধি, আর, গলায় পাবে জোর—এই কথা সকলের সামনে ঘোষণা করবার। আরো একটি কথা—

—আজ্ঞা করুন।

সন্ন্যাসী বল্লেন, শিশুকে তুমি দুধ খেতে দাওনি, তারই ফলে তোমার পেটে দুধ থাকছে না! তুমি আরো ঘোষণা করে দাও রাজা, যে, তোমার রাজ্যে প্রত্যেক শিশুকে দুধপানের ব্যবস্থা রাজকোষ থেকে করে দেবে। হাতজোড় করে রাজা বল্লেন, আমি নিশ্চয়ই সে ঘোষণা করবো সন্ন্যাসী।

খবর কানে-কানে পৌঁছুলো রাণীর কাছে। রাণী আপত্তি করে বল্লেন, বিছানার সঙ্গে মিশে আছেন রাজা, চৌমাথার মোড়ে

যাবেন কি করে? রাজকন্যা বল্লেন, আমি বাবার হয়ে সন্ন্যাসীর কাছে ক্ষমা চাইছি, প্রায়শ্চিত্ত করছি—

রাজকুমার বল্লেন, পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ত' ছেলেই করতে পারে, একই রক্ত বইছে আমার ধমনীতে। কিন্তু তপস্বী নিশ্চল...পাথর, তার কথার নড়চড় কিছুতেই হবে না। মন্ত্রি বল্লেন, আমরা রাজাকে ফিরে পেতে চাই...কাজেই তপস্বীর কথা অক্ষরে অক্ষরে রাজাকে পালন করতে হবে। রোগ যেমন গুরুতর, তার চিকিৎসাও ত' তেমনি সাঙ্ঘাতিক হবে!

সন্ন্যাসীর কথায় রাজা উঠে দাঁড়ালেন। যে বিছানা থেকে তিনি ক'বছর উঠতে পারেন না, সেই শয্যাত্যাগ করে মন্ত্রমুগ্ধের মতো রাজপুরীর সোপান বেয়ে তিনি এগিয়ে চল্লেন।

রাজকন্যা ছুটে এলেন পাদুকা নিয়ে—রাজপুত্র এগিয়ে এলেন রাজছত্র নিয়ে, অঙ্গুলি সঙ্কেতে তপস্বী তাদের থামিয়ে দিলেন। বল্লেন, খালি পায়ে খোলা মাথায় রাজাকে অগ্রসর হতে হবে। রাজা এগিয়ে চলেন—কিসের শক্তিতে কে জানে!

প্রজারা শুনে অবাক হয়ে পথের দু'ধারে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তাদের কারুর মুখে টু শব্দ নেই—সবাই নির্ব্বাক।

কেউ-কেউ আবার মারমুখো হয়ে বল্লে, আমাদের রাজাকে কষ্ট দিচ্ছে যে সন্ন্যাসী তাকে আমরা মেরে ফেলবো; সইবো না তার অন্যায় জুলুম।

হাত তুলে মন্ত্রি তাদের থামিয়ে দিলেন। ধীরে ধীরে রাজা এসে দাঁড়ালেন চৌমাথার মোড়ে। অবাক কাণ্ড!

যে রাজার কথা বলতে অসুবিধা হ'ত—তিনি চীৎকার করে

ঘোষণা করলেন,—"শিশুরে বঞ্চিত করা জীবনের গুরু অপরাধ।" তারপর নিজের পাপের কাহিনী সবাইকে শুনিয়ে দিলেন। আরো ঘোষণা করলেন যে, তার রাজ্যে সব শিশু প্রত্যহ রাজ-ভাণ্ডার থেকে প্রয়োজনীয় দুধ পাবে।

এইভাবে রাজা একমাস ধরে ঘোষণা করে চললেন। রাজ্যে আবার পাখীর দল ফিরে এলো—ফিরে এলো পশুরা। দুগ্ধবতী গাভীতে রাজার গোশালা ভরে গেল। কামধেনুর মতো তারা রাজ্যের শিশুদের দুধ বিতরণ করতে লাগলো।

স্বাস্থ্যবান শিশুর দল ফোটা ফুলের মতো গোটা রাজ্যকে উদ্যানে পরিণত করল।

যেখানে রাজা বিশ বছর আগে পাতার কুটীর ভেঙে ফেলেছিলেন, সেইখানে তাঁর আদেশে দেশের নামকরা শিল্পী নির্ম্মাণ করলেন মা ও শিশুর মর্ম্মর মূর্ত্তি। মা শিশুকে দুধপান করাচ্ছে। সেই মূর্ত্তি দেখে কেউ আর চোখ ফেরাতে পারে না—এমন মন-ভোলানো প্রাণ-জুড়োনো সে মর্ম্মরমূর্ত্তি!

তারি তলায় রাজার আদেশে বড-বড় অক্ষরে খোদাই করা হ'ল—

"শিশুরে বঞ্চিত করা জীবনের গুরু অপরাধ!"

মূর্ত্তিকে কেন্দ্র করে নির্ম্মিত হ'লো এক সুন্দর উদ্যান। সেই উদ্যানে দেশের ছেলেমেয়েরা মনের আনন্দে খেলা করতে লাগলো। দেশের রাজা পূর্ণ-স্বাস্থ্য লাভ করলেন, কিন্তু সেই তপস্বীকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

পরাজয়

সন্তুব ঠাকুর্দা পূর্ববঙ্গের ডাক সাইটে জমিদার। এবার তিনি কলকাতায় এসেছেন পূজোর সওদা করতে। জিনিস-পত্তর তো আর কম কিনতে হয় না! কেননা—গোটা গাঁ-খানার লোক তাঁরই প্রজা। পূজোর সময় সকলকে তিনি নতুন কাপড়-চাদর বিতরণ করে থাকেন। গ্রামের সমস্ত লোক এই তিনটি দিনের আশায় হা-পিত্যেশ করে বসে থাকে।

জমিদারবাবু এবার নিজে এসেছেন, তাই কিনতে কিনতে জিনিস-পত্তর পর্বত-প্রমাণ হয়ে উঠল।

ঠাকুর্দা বল্লেন, ওই ভীড়ের মধ্যে ট্রেনে আমি কিছুতেই যেতে পারবো না; তার চাইতে দুটো বড়ো নৌকো ভাড়া করা হোক। একটায় যাবে জিনিস-পত্তর, আর একটায় যাবো আমি। একে-বারে বাড়ির খিড়কির দোরে গিয়ে নামতে পারবো।

সন্তু বল্লে, আমি কখনো দেশের পূজো দেখিনি, আমি তোমার সঙ্গে যাবো ঠাকুর্দা! সন্তুর বাবা হাইকোর্টের বড় ব্যারিস্টার; দেশ-গাঁয়ে যাবার বিশেষ পক্ষপাতী তিনি নন। ছুটিতে হামেশাই তিনি পশ্চিমে হাওয়া খেতে যান।

কিন্তু সন্তু যখন ঠাকুর্দাকে পেয়ে বসল, তিনি আর আপত্তি করতে পারলেন না। কাজেই সন্তুর দেশে যাওয়াই স্থির হোলো।

স্বপনবুড়োর ঝুলি

নৌকো যখন গিয়ে পদ্মায় পড়ল তখন সন্তুর খাঁচায়-থাকা-মন যেন ডানা মেলে লক্ষ লক্ষ পাখিব মত শরতের হালকা মেঘের সংগে উড়ে যেতে চাইলে। নদীব তীব ঘেঁসে কাশফুলের মেলা বসেছে। সন্তুর ইচ্ছে হল. হাওয়ায় মেতে ঐ কাশফুলের সংগে লুকোচুরি খেলে, দূবেব ঐ বাড়িখানির ধারে শিউলী গাছেব তলায় বসে ফুল কুড়িযে মালা গাঁথে -তাবপর সেই মালা ছুলিয়ে দেয় ঐ উড়ন্ত বলাকাদলেব গলায়। সন্তুব মনে হল, পাল তোলা নৌকো, নদীর কল-কল্লোল, বাঁশ-বনে বাতাসের খিলখিলে হাসি···শরতের সোনালী রোদ--এই সকলের সংগে তাব মনেব আসন পাতা আছে। কলকাতাব ইটপাথবেব পুবীব ও কেউ নয়—বরঞ্চ সে এদেরই একজন।

এক জায়গায় জেলেব দল বসে মাছ ধরছিল। কপোলী ইলিশ মাছে জাল একেবারে ছেয়ে গেছে। ঠাকুর্দা বল্লেন, গরম ভাতের সংগে এই টাটকা ইলিশ মাছেব ঝোল। কি বল সন্তু? আর আমার সংগে দেশের খাঁটি গাওয়া ঘী ত রয়েছে।

অতি সাধাবণ ভাবে রান্না কবা ইলিশমাছের ঝোলের যে এমন স্বাদ হতে পাবে সন্তু কোনোদিন তা ধারণাও করতে পারে নি। নদীব ওপরে ওর ক্ষিদেও দ্বিগুণ বেড়ে গেল নাকি?

সন্তুর দিনগুলো সকাল-সন্ধ্যের রঙীন মেঘের মতোই বড় বিচিত্র গতিতে কাটতে লাগলো।

সেদিন বিকেলের মুখে নৌকো নদীর পাড় ঘেঁসে চলেছিলো। ঠাকুর্দার সংগে সন্তু ছাদের ওপর চেয়ার ফেলে বসেছিল।

হঠাৎ দেখা গেল, একটা লোক নদীর ধার দিয়ে ছুটতে ছুটতে

আসছে আর প্রাণপণে হাতের ইশারায় নৌকোটাকে থামাতে বলছে !

ঠাকুর্দা আরামে গড়গড়া টানছিলেন—একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বল্লেন, লোকটা কী বলছে রে ?

মাঝিরা নৌকোর গতি একটু মন্থর করলে। লোকটা ছুটতে ছুটতে এসে প্রায় নৌকোর কাছাকাছি পৌছুল। তারপর হাঁফাতে হাঁফাতে বল্লে, বাবু দয়া করে আমায় তুলে নাও—ওই হোথায় যখন বাঁক ঘুরবে আমি নেমে যাবো।

ঠাকুর্দা ছাদের ওপর থেকে বল্লেন, কেন, খেয়া নৌকোয় পার হয়ে যা না—

লোকটি সংগে সংগে ছুটতে ছুটতে মুখ কাঁচুমাচু করে বল্লে, খেয়া নৌকো বন্ধ হয়ে গেছে বাবু; তবু আমি তোমাদের কষ্ট দিতুম না বাবু—কিন্তু আমার মেয়েটির বড্ড অসুখ—ঐ গাঁয়ের হাসপাতালে গিয়েছিলুম ওষুধ আনতে—আমায় পার করে দাও বাবু—নইলে মেয়েটা বোধ করি আজ রাত্তিরেই—

লোকটা তার কথা শেষ করতে পারলে না। কিন্তু তখনো নৌকোর সংগে ছুটতে লাগলো। মাঝিরা ঠাকুর্দার মুখের দিকে তাকালো।

ঠাকুর্দা জিজ্ঞেস করলেন, এ জায়গাটার নাম কী রে ?

লোকটা জবাব দিল, খুনীব চর।

ঠাকুর্দা যেন আঁৎকে উঠলেন। তারপর লোকটা যেন শুনতে না পায়, এই ভাবে মাঝি-মাল্লাদের উদ্দেশ করে বল্লেন, সাবধান ! এখানে নৌকো ভিড়েস নে; এখানে ডাকাতের বড্ড ভয়।

লোকটার যে রকম ষণ্ডা-গুণ্ডা চেহারা দেখছি—ও ডাকাতের দলের লোক না হয়ে যায় না। ছল করে আমাদের মন গলিয়ে নৌকোয় উঠে নিশ্চয়ই ফ্যাসাদে ফেলবার মতলব। নৌকো মাঝ নদীর দিকে ছেড়ে দে—

ঠাকুর্দার আদেশ পেয়ে মাঝির দল বদর বদর বলে হাল ঘুরিয়ে দিলে। প্রকাণ্ড একটা ফাঁড়া কাটলো মনে করে ঠাকুর্দা গুড়ুক গুড়ুক করে তামাক টানতে লাগলেন।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, ডাকাতটা আমাদের নৌকোয় এলে কী হতো? ঠাকুর্দা বল্লেন, আমাদের মেরে-কেটে সব জিনিস-পত্তর টাকা-কড়ি নিয়ে পালিয়ে যেতো. আশে-পাশেই ওদের দলের লোক আছে নিশ্চয়। ওই ব্যাটাই সঙ্কেত করে তাদের ডাকৃত।

ঠাকুর্দার কথা শুনে ভয়ে সন্তু ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগলো। তার চাইতে ট্রেনে যাওয়া ছিল অনেক ভালো।

হঠাৎ পাড়ের কাছে ঝপাং ক'রে কিসের একটা শব্দ হতেই সবাই আৎকে উঠ্‌ল! মাঝিরা বল্লে, সেই লোকটা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরাচ্ছে।

ঠাকুর্দা ব্যস্ত হয়ে বল্লেন, ডাকাত! ডাকাত! তোরা তাড়া-তাড়ি আরো একটা পাল খাটিয়ে নৌকো জোরে ছেড়ে দে—

সন্তু ভয়ে ঠাকুর্দাকে জড়িয়ে ধরলে, ঠাকুর্দা চোখ বুঁজে ক্রমাগত দুর্গানাম জপ করতে লাগলেন। পালে বাতাস পাওয়াতে নৌকো তড়িৎ গতিতে এগিয়ে চললো।

সন্ধ্যের মুখে হঠাৎ নদীর চেহারা গেল বদলে। ঈশান কোন্ থেকে কে যেন অতি দ্রুতবেগে এক ছোপ কালি মাখিয়ে

দিচ্ছে আকাশের গায়। দেখতে দেখতে সেই কালি গোটা আকাশটা ছেয়ে ফেল্লে। আকাশের ছায়া নদীর বুকে পড়তে নদীর জলও গাঢ় কালো কালিতে রূপান্তরিত হলো।

মাঝিরা সামাল সামাল রব করে পাল নামিয়ে নেবার আগেই নদীর বুকের যা কিছু সুন্দব তাই অশুভ পায়ে দলে ছুটে এল আশ্বিনের উন্মত্ত ঝড়।

ঝড়েব ঝাপটাটা এলো সামনে থেকে তাই যে পথ দিয়ে নৌকো এসেছিলো সেই পথেই আবার তাকে ঠেলে নিয়ে চল্লো একখান মোচার খোলার মতো।

হঠাৎ নৌকোটা একটা মোচড় খেয়ে তীব্র গতিতে তীবে গিয়ে ধাক্কা দিলে। সংগে সংগে ঠাকুদার বাহুবন্ধন থেকে খসে সন্তু একেবাবে নদীর জলে ছিট্‌কে পড়ল। তাল সামলাতে না পেরে ঠাকুর্দা পড়লেন গিয়ে ডাঙ্গায়। নিমেষের মধ্যে এমন ভাবে এই শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটে গেল যে, ঠাকুর্দা ভালো ক'রে বুঝতেই পারলেন না কী তাঁর হাবালো। ঠিক ঐ পাড়ের ওপরেই একটা মাঝি-বাড়ি।

ঝড়ের গোঙানিকে ছাপিয়ে নৌকোর ধাক্কা লাগার শব্দ তাদের কানে গিয়ে পৌঁছেছিল। শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি বেবিয়ে এলো এক বৃদ্ধ। হাতের মৃদু লণ্ঠন ঝড়েব ঝাপটায নিভে গেল। কিন্তু নদীর পাড়ের আঁধারের সংগে বৃদ্ধের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। মূর্ছিত ঠাকুর্দাকে চিনে নিতে তাঁর বেশি বেগ পেতে হলো না। ঐ খানে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে ডাকতেই আর একটি বলিষ্ঠ যুবক ঘব থেকে বেরিয়ে এসে ঠাকুর্দাকে পাঁজা কোঁলে তুলে ভেতরে নিয়ে গেল।

খানিকক্ষণ বাদে জমিদারবাবু জ্ঞান হলে তাকিয়ে দেখলেন, তিনি যাকে সেদিন বিকেলে পার করেন নি—সেই বলিষ্ঠ কৃষ্ণবর্ণ লোকটি ঝুঁকে [illegible]ড় এক দৃষ্টে তাঁকে দেখছে।

প্রথমটা [illegible]ড়র কথা তাঁর মনেই হলনা—ডাকাতের হাতে পড়েছেন ভেবে তার বুকটা দুরু দুরু কাঁপতে লাগলো।

কিন্তু সে এক মুহূর্ত মাত্র…তার পরেই তাঁর স্মৃতিশক্তি ফিরে এলো।

—সন্তু-সন্তু—আমার সন্তু—সে যে নদীর জলে ভেসে গেছে!

বুড়ো মাঝির ছেলে সেই বলিষ্ঠ কালো লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, ও! আমি বুঝতে পেরেছি বাবু! যে ছেলেটিকে ছাদের ওপর তোমার সংগে দেখেছিলাম—তারই কথা বলছ বুঝি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ! বৃদ্ধ জমিদার আঁকুপাঁকু করে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন—সে আমার নাতি—ওর বাপের কাছ থেকে আমিই ওকে ছিনিয়ে এনেছিলাম—এখন আর আমার যে মুখ দেখাবার যো রইলো না।

কালো লোকটি জমিদারবাবুকে জোর করে শুইয়ে দিয়ে বল্লে, তুমি কিচ্ছু ভেবোনা বাবু—আমি আমার ডিঙি নিয়ে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ছি…দেখি তোমার নাতিকে ফিরিয়ে আনতে পারি কিনা।

বুড়ো মাঝি মাথা নেড়ে বল্লে,—সেই ভালো, দেখ্ যদি ভদ্র-লোকের উপকার করতে পারিস…হয়তো তাহলে দিদিমনিরও ব্যামো ভালো হয়ে যাবে।

মাঝির ছেলে যখন বৈঠে নিয়ে রওনা হল তখন বৃষ্টি থেমে

গিয়েছে, কিন্তু ঝোড়ো হাওয়ার গোঙানি সমভাবেই চলেছে পাগলা নদীর বুকের ওপর দিয়ে।

মাঝির ছেলের ডিঙিখানা নাচতে নাচতে নদীর [illegible] জলের সংগে দূরে মিলিয়ে গেল—সেই দিকে তাকিয়ে [illegible] জমিদারের দুই চোখ জলে ভরে এলো!

ক্রমে ভাঙা মেঘের ফাঁক দিয়ে দু-এক টুকরো চাঁদের আলো উঁকি ঝুঁকি মারতে লাগলো। ঘনকৃষ্ণ আকাশের বুকে তারার দলও জেগে উঠলো…কিন্তু বাতাসের গোঙানির আর বিরাম নেই। আর নেই সেই বৃদ্ধ জমিদারের চোখে ঘুম। জমিদারবাবু এক একবার দারুণ হতাশায় বিছানার ওপর শুয়ে পড়েন, তারপর কী একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ছুটে বাইরে বেরিয়ে যান্। উন্মত্ত নদী তখনো ফেনা নাচিয়ে—কূল ছাপিয়ে ছুটে চলেছে। তার সেই ক্ষুধিত গ্রাস থেকে যে সন্তু ফিরে আসবে একথা কোনো ক্রমেই জমিদার ভাবতে পারেন না। শুধু দুই চোখ আকাশের দিকে তুলে ধরেন; সেখানে কানাকানি করে তারার দল কি বলে…পৃথিবীতে বসে বৃদ্ধ তা শুনতে পারেন না।

মাঝি-বাড়ির ভেতর এই সময় আর একটি বুড়োর চোখেও ঘুম নেই! নাতনীর শিয়রে বসে বুড়ো মাঝি কেবলি চোখের জল ফেলছে…আর ভগবানকে ডেকে বলছে…আমার ছেলে যেন ওর নাতিকে ফিরিয়ে আনতে পারে—তবেই আমার দিদিমণি ভালো হয়ে উঠবে।

শেষ রাত্তিরের দিকে বাতাসের বেগ একটু কমতে জমিদারের চোখ দুটো ঘুমে জড়িয়ে এসেছিল। হঠাৎ নদীর কিনারায় নৌকো

লাগাবার খস্ করে একটা শব্দ হতেই' বুড়োর তন্দ্রা ছুটে গেল।

জমি[illegible]বু ছুটে বাইরে এলেন। পাণ্ডুর চন্দ্রালোকে দেখা গেল—মা[illegible] ছেলে কাকে যেন বুকে চেপে ধরে ডিঙি থেকে নামছে। এই দৃশ্য দেখে জমিদারের বাক রুদ্ধ হয়ে গেল।

রাক্ষসী নদী—! সেই তাকে ফিরিয়ে দিলি—তবু তার প্রাণটা ফিরিয়ে দিলি না কেন?

বৃদ্ধ টল্‌তে টল্‌তে সেই নদীর ধারেই পড়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মাঝির ছেলে এক হাতে তাঁকে ধরে ফেলে বল্লে, তুমি ডর পেয়োনা বাবু, ভগবান তোমার নাতিকে বাঁচিয়েছে। ঝড়ে নদীর কিনারে একটা গাছ ভেঙ্গে পড়েছিল—তারি সংগে ওর জামা আট্‌কে যায়! আমি গিয়ে দেখি—একটা ডালের সংগে ছেলেটা ঝুলছে। ভয়ে ও অচৈতন্য হয়ে পড়েছে বাবু, মুখে চোখে জল দিয়ে বাতাস করলেই উঠে পড়বে। ভগবান ওকে রক্ষা করেছেন বাবু—

শ্রান্ত, ক্লান্ত মাঝির ছেলে অচৈতন্য সন্তুকে জমিদারের কোলে তুলে দিতেই বাড়ির মধ্যে বুড়ো মাঝির বুক-ফাটা চীৎকার শোনা গেল—দিদিরে দিদি—

মাঝির ছেলে পাগলের মতো ভেতরে ছুটে গেল!

বৃদ্ধ জমিদার সন্তুকে কোলে নিয়ে সেইখানে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। নদীর ওপারে পূব আকাশকে রক্ত রাঙা করে তখন সূর্য উঠছে! বৃদ্ধ সেই দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে আপন মনে যেন কাকে প্রশ্ন করলেন, আমাকে এমন করে তুমি মাটির সংগে

মিশিয়ে দিলে কেন—দয়াময় ? ওদের কোল শূন্য না করে কি তুমি আমার কোল ভবে দিতে পারতে না ? এই কি তোমাব বিচার ?

রাত্রির অন্ধকারে আর মুখ লুকোবারও যো বই[illegible]া ; তরুণ-তপন তখন নিষ্ঠুর ভাগ্য-বিধাতার মতোই আকাশকে অগ্নিময় কবে তুল্লে !

ডাকুর ডিঙি

ওকে অনেকেই জলচর বলে সন্দেহ করে।

পূর্ব্ব-বঙ্গের এক পাড়াগাঁয়ে তার বাড়ী। ডাকু বল্লে চেনেনা এমন লোক সে তল্লাটে মেলা ভার। ডাকুর সাথের সাথী তার ডিঙিটি। খাল থেকে নদীতে হামেশাই যাতায়াত করে। বাড়ীতে থাকবার মধ্যে এক পিসিমা। পুঁটি মাছের মত ফর্ ফর্ করে ডাকু তার ডিঙি চালিয়ে যায়, এ-বাড়ী থেকে ও-বাড়ী, এ-পাড়া থেকে ও-পাড়া। এমন কায়দায় সে ছোট্ট বৈঠা টানে তাতে ডিঙির তলাটা জল ছোঁয়-কি-ছোঁয় না।

শত কাজ নিয়ে ডাকু তার ডিঙির সাথে যুক্ত থাকে। ওর জন্ম থেকে যদি ঘড়ি-ঘণ্টা নিয়ে হিসেব করা যায় তো দেখা যাবে ওর জীবন ডাঙার থেকে জলেই বেশী কেটেছে।

পিসিমা সব সময় মুখ ঝাম্টা দিয়ে বলে, নেই কাজ তো খই ভাজ! এত করে বলি, দু-দণ্ড বাড়ীতে মন স্থির করে বোস! তা' ডিঙির গলুই ছাড়া হতভাগার বসবার জায়গা নেই! জমিতে দুটো বেগুন, কুমড়ো, শশা লাগালে সংসারে আয় দেয়। কিন্তু সেদিকে নজর নেই!

পিসিমার অভিযোগ কিন্তু মিথ্যা নয়। পাড়াপ্রতিবেশীদের সাত-সতেরো কাজ নিয়ে ডাকু সব সময়েই যেন ঘোড়ায় চড়েই আছে।

তবে ডাকুর ঘোড়া জমিন দিয়ে যায় না, জল দিয়ে ছোটে।

স্বপনবুড়োর ঝুলি

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে এক-কোঁচড় মুড়ি নিয়ে ডিঙিতে চাপ্‌ল।

পিসিমা পিছু ডেকে বল্লে, ওরে, একেবারে দুপুর গড়িয়ে দিস্‌নে যেন! তোর জন্যে ফ্যানাভাত রান্না করবো, ডাঁটার বড়ি সেদ্ধ দিয়ে তুই খেতে বড্ড ভালবাসিস। সতু গয়লার কাছ থেকে একটু গাওয়া ঘি চেয়ে রেখেছি। গরম ভাতে খেতে দিব্যি হবে।

ডাকু জবাব দিল, সে জন্যে তুমি কিছু ভেব না পিসিমা, ঘণ্টার ছোট ভাইটা বড় ব্যায়রামে পড়েছে। ঘণ্টার মা আমায় খুব ধরেছে, তাকে নিয়ে একটু সরকারী ডাক্তারখানায় যেতে হবে। আমি যাব আর আস্‌বো।

এর পর পিসিমা যে কি কথা বল্লে, সেকথা ডাকুর কানে গেল না,...কারণ এরই মধ্যে তার ডিঙি খালের পথে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

মোড় ঘুরতেই দেখা পরাণ-সাধুর সঙ্গে। বুড়ো খালের ধারে বসে আপন মনে ধুঁক্‌ছে। হাতে একটা খালৈ। বাজারে যাবে এমনি একটা নৌকোর প্রত্যাশায়ই বসে আছে। ডাকুকে ডিঙির ওপর দেখে বুড়ো যেন হাতের মুঠোয় আকাশের চাঁদ খুঁজে পেলো। সরু হাড় বের করা হাতটা উঁচু করে ধরে বল্লে, ও বাবা ডাকু, কাল রাত্তির থেকে জ্বরে বড় ধুক্‌ছি। ছোট মেয়েটাও জ্বর থেকে আজ অন্ন-পথ্য করবে। এই খালৈটা নিয়ে যা বাবা—আর কিছু না পাস্‌, দুটি পুঁটি মাছ অন্তত এনে দিস্‌...একটু আঁশটে গন্ধ না হলে মেয়েটা দু-মুঠো ভাত মুখে দিতে পারবে না।

ডাকু মৃদু আপত্তি করে বল্লে, কিন্তু খুড়ো, আমায় যে ঘণ্টার ছোট

ভাইটিকে নিয়ে এক্ষুণি একবার সরকারী ডাক্তারখানায় যেতে হবে।

পরাণ সাধু মরিয়া হয়ে জবাব দিলে, ঐত আর দু-পা গিয়েই রথ খোলার বাজার। তোকে 'ব্যাগ্যাতা' করে বলছি। খালৈটা নিয়ে যা। এক টুক্‌রো মাছ না পেলে মেয়েটা বড় কান্নাকাটি করবে। সাতদিন পরে আজ ভাত খাচ্ছে কিনা। হয় তো কেঁদে-কেটে আবার জ্বরই ডেকে আন্‌বে।

নিরুপায়ের সুরে ডাকু বল্লে, আচ্ছা খুড়ো, তুমি যখন এতো করে বল্‌ছ, দাও খালৈটা। কিন্তু খালৈ নিয়ে খালের ধারে বৈঠাব খোঁচা দিতেই ডাকুর মনে পড়ে গেল যে পরাণ সাধুর কাছ থেকে মাছের দাম নেয়া হয়নি। পেছন ফিরে বল্লে, ও খুড়ো, মাছ আন্‌তে খালৈ দিলে, পয়সা কই?

পাছে পয়সা নিতে সে আবার ফিরে আসে এই ভয়ে সাধু তাড়াতাড়ি বল্লে, শুভ-কাজে যাচ্ছিস্ আব পেছু ফিরিস্ নে ডাকু. মাছটা নিয়ে আসিস্,- আমি ডান-হাতে বাঁহাতে পয়সা গুঁজে দেবো'খন।

ডাকু বুঝতে পারলে খুড়োর ডান-বাঁ হাতের যোগাযোগ কোনো কালেই হবেনা—কাছেই মাছের পয়সা পাবার আশাও বিশেষ নেই।

তবু সে মুখের উপর কাউকে 'না' বলতে পারে না। সকলের অনুরোধ দিন-রাত তাকে বয়ে বেড়াতে হয়। সাধে কি আর পিসিমা বলে, "নেই কাজ তো খৈ ভাজ।"

এই ভাবেই তাকে এ-বাড়ী থেকে ও-বাড়ী অকারণে খৈ ভেজে বেড়াতে হয়।

অবশ্যি এজন্যে গাঁয়ের সবাই তাকে ভালবাসে, ডাকু বল্‌তে গায়ের ছেলে-বুড়ো-ঝি সবাই অজ্ঞান। সকলের বোঝা বয়ে হাসি কুড়িয়ে বেড়ানোতে যে কি মধুরতা, ডাকুই ভাল বলতে পারে।

“কপালকুণ্ডলা’ বইয়ে বঙ্কিমচন্দ্র নবকুমারকে উপলক্ষ্য করে এই রকমই কি একটা কথা যেন বলেছেন। যার কাঠ কাটা স্বভাব —পরের জন্যে কাঠ না কেটে সে থাক্‌তে পারে না।

এমনি চুল-বুলে স্বভাব আমাদের ডাকুর।

ডাকুর নৌকো এগিয়ে চলেছে—ঝোপ-ঝাড় পেরিয়ে বাঁশ-বন ছাড়িয়ে, নন্দীদের ইটের পাঁজার পাশ দিয়ে—হঠাৎ ডাক এলো পাশের বাড়ীর পুকুর ঘাট থেকে। মিনুদি তাকে হাতছানি দিয়ে ডাক্‌ছে।

ডাকু গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস কর্‌লে, কি মিনুদি, কিছু বল্‌বে? মিনুদি তবু কথা বলে না, হাতছানি দিয়ে ঘাটের পাশে আস্‌তে ইসারা করে দিলে।

ডাকুর ডিঙি সকলের কাছে সমান আজ্ঞাবহ। এগিয়ে এলো বাড়ীর খিড়কীর ঘাটে।

ডাকু ভয়ে শুধোলে, কি হয়েছে মিনুদি?

মিনুদি আঁচলে চোখ দুটো একবার মুছে নিয়ে বল্লে, তোর ভগ্নি-পতির বড় অসুখ রে ডাকু। যমে-মানুষে টানাটানি। কিন্তু এরা আমাকে চিঠি লিখ্‌তে দেবেনা। সেই তত্ত্ব পাঠানো নিয়ে কি কথা কাটাকাটি হয়েছিল তাই, মনুদি আর কিছু গুছিয়ে বল্‌তে পারেনা—তার দু-চোখ জলে ভরে ওঠে। শুধু আঁচলের তলা থেকে লুকোনো একটা চিঠি বের করে দেয়।

স্বপনবুড়োর ঝুলি

ডাকু বল্লে, কিছু তোমায় বল্‌তে হবেনা মিনুদি, আমি বুঝে নিয়েছি, চিঠিটা ডাক-বাক্সে ফেলে দিতে হবে তো? মিনুদি ঘাড় নাড়তেই শিশির বিন্দুর মত আর দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে।

লোকের চোখের জল ডাকু সইতে পারে না। তর্-তর্ করে এগিয়ে চলে ডিঙি ঘণ্টাদের বাড়ীর দিকে।

কিন্তু সোজা পথে যাবার যো ডাকুর নেই। ওর জন্যে ঘাটে ঘাটে কাজের বোঝা জমা হয়ে আছে। বিশ্বঠাকুর বুড়ো শিবতলা থেকে ডেকে বল্লেন, ও বাবা ডাকু, আমায় একটু পার করে দে না' —সেন বাড়ী গিয়ে শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করতে হবে। সময় বয়ে গেলে সব পণ্ড।

ডাকুর ডিঙি বাঁয়ে ঘুরে যায়।

এমনি করে কাজের বোঝা চুকিয়ে যখন সে গিয়ে ঘণ্টাদের বাড়ী হাজির হল—অনেকটা বেলা হয়ে গেছে তখন।

ঘণ্টার মা রোগা ছেলেকে নিয়ে আকুল নয়নে পথ চেয়ে ছিলেন। তাকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে বল্লেন, এই যে বাবা ডাকু, সকাল থেকে তোর পথ চেয়ে বসে আছি। ছেলেটার অসুখ আরো বাড়া-বাড়ি হয়েছে বাবা।

ডাকু একটু লজ্জিত হয়ে জবাব দিলে, তুমি কিছু ভেবোনা মাসিমা। হাসপাতালে ওকে দেখিয়ে একটু বাদেই আমি ফিরে আস্‌ছি। তুমি ওকে বার্লি খাইয়ে দাও, ফির্‌তে একটু বেলা হবে তো? পরাণ খুড়োর মেয়ের জন্যে আবার বাজার থেকে একটু মাছ কিনে নিয়ে আস্‌তে হবে। সে আজ অন্ন-পথ্যি করবে কিনা।

স্বপনবুড়োর ঝুলি

ঘণ্টার মা কপালে একটা চড় মেরে বল্লেন, আ আমার কপাল! বার্লি কোথায় পাব শুনি? একটু ফ্যান খাইয়ে দিয়েছি।

ডাকু আঁতকে উঠে বল্লে, অ্যাঁ, করেছ কি মাসিমা! এতদিনেব জ্বোরো রুগীকে তুমি ফ্যান খাইয়ে দিলে?

দেবো না তো কি করবো শুনি? ছেলেটা যে ক্ষিদের জ্বালায় সেই রাত্তির থেকে কান্না জুড়ে' দিয়েছিল।

মুখ ঘুরিয়ে মাসিমা চোখের জল মোছেন। তারপর কথাটা চাপা দেবার জন্যেই যেন তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, আর দেরী করিস্ নে বাবা ডাকু। ডাক্তার হয় তো সরকারী হাসপাতালের দরজা বন্ধ করে দিয়েই চলে যাবে।

ডাকুর ঐ এক দুর্ব্বলতা, কারো চোখের জল সইতে পারেনা। ডিঙির দিকে পা চালিয়ে জবাব দিলে—হ্যাঁ, তুমি ওকে কোলে করে নিয়ে এসে ডিঙিতে চাপিয়ে দাও। দুর্গা-দুর্গা বলে রওনা হয়ে পড়ি আমরা—

একটা বেড়াল পুষলেও তার ওপর মানুষের মায়া হয়। ডিঙির ওপর ডাকুর মায়া তার চাইতে আরো বেশী।

সে ওর গায়ে হাত বুলোয়—আপন-মনে তার সঙ্গে কথা কয়।

সর্ সর্ করে. ধান-ক্ষেতকে চুলে চিরুণির মতো দু-ভাগে চিরে দিয়ে ডিঙি যখন এগিয়ে চলে ডাকু চোখ বুজে ভাবে ডিঙি তার সঙ্গে ফিস্‌ফিস্ করে কথা কইতে-চাইছে। চারপাশে তাকিয়ে দেখে কেউ কোথাও আছে কিনা।

স্বপনবুড়োর ঝুলি

একটা মাছ-রাঙা পাখী উড়ে পালায়। ডিঙি কথা বলতে লজ্জা পায় কিনা কে জানে!

ডিঙির সঙ্গে ডাকুর মনের মিতালি।

পাশের জঙ্গল থেকে সে নিজে গাব পেড়ে নিয়ে আসে। সেই গাবের রস সে সযত্নে ডিঙিতে লাগায়।

একবার একটা জোড়া একটু ফাঁক হয়ে গিয়েছিল। গাব লাগিয়ে দিতে দু-বছর আর কোনো গোলমাল হয়নি। নৌকোর একটু এদিক-ওদিক হলে সে বুঝতে পারে। মা যেমন ছোট ছেলেকে কাছে টেনে নিয়ে গালে গাল লাগিয়ে দেহের উত্তাপ নেয়, তেমনি ডাকু তার ডিঙিতে হাত বুলিয়ে তার কুশল প্রশ্ন করে। শেয়ালের যেমন ল্যাজ, কাকাতুয়ার যেমন ঝুটি, সিংহের যেমন কেশর আর কর্ণের যেমন কবচ-কুণ্ডল—ডাকুর তেমন ডিঙি। একটাকে বাদ দিয়ে গাঁয়ের কেউ আর একটার কথা ভাবতে পারে না।

ডাকুর মাছ ধরারও ভারী সখ। ডিঙির ওপর ছোট্ট ছিপ, গেঁথে মাছ মারবার জন্যে কোচ, খ্যাপলা জাল, এই সব নিয়ে সে প্রায়ই বিকেলের দিকে ধান-ক্ষেতের ভেতর ঢোকে। ওর অধ্যবসায় আর নিষ্ঠায় আমদানী নেহাৎ কম হয় না। সেই মাছগুলিই কি সে বাড়ী নিয়ে আসে? নিজে তো একটা মানুষ। কার বাড়ীতে কে অন্ন পথ্যি করবে, কে পয়সার অভাবে ছেলে-মেয়ের মুখে একটুকরো মাছ তুলে দিতে পারে না—তাদের হদিশ ডাকুর নখাগ্রে। সবাইকে বিলিয়ে একটা বড় পুঁটি কিংবা দুটি পাবদা নিয়ে বাড়ী ফিরে পিশিমার গাল খেয়ে বোকার মত সে হাসতে থাকে।

সেই হাসির মধ্যে যে আত্ম-তৃপ্তি লুকিয়ে থাকে কেউ হয়ত তার সন্ধান রাখেনা।

ডাকুর নিজের কাছে তার দাম লাখ টাকা।

*　　*　　*

হঠাৎ একটা কালো-মেঘের ছায়ায় এই অঞ্চলের সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

যুদ্ধের খবর এতদিন ছিল বহুদূরে আর কাগজের পাতায়। কিন্তু জাপানীরা নাকি এগিয়ে আস্‌ছে বাংলা দেশের দিকে।

সরকারের হুকুম, সব ডিঙি নৌকো বাজেয়াপ্ত করা হবে। নইলে জাপানীরা এসে এই সব ডিঙি নৌকো দখল করে নদী-নালা পার হয়ে নাকি গোটা বাংলা দেশটাই তাদের হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে নেবে।

ব্যাপারটা যদি সত্যি হয় তবে ভয়ের কথা সন্দেহ নেই।

ডাকু প্রথমে কথাটা কানে তোলেনি।

এই তো তার এক ফোঁটা ডিঙি—মোচার খোলার মত ভেসে বেড়ায়। সেদিকেও কি সরকারের দৃষ্টি পড়বে?

হঠাৎ খবর এলো, সেই অঞ্চলের সমস্ত জেলে-ডিঙি সরকার দখল করে নিয়েছে।

যারা মাছ ধরে আর মাছ বিক্রী করে খায়, তাদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল।

কিন্তু মহাসমরের বৃহত্তর প্রয়োজনে চোখের জল বাষ্প হয়ে উড়ে গেল।

স্বপনবুড়োর ঝুলি

ডাকু কদিন থেকেই ভয়ে ভয়ে ছিল। কিন্তু সেখানেও পালে বাঘ পড়ল।

ডাকুর ছোট্ট ডিঙি সরকারের সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারল না। থানা থেকে লোক এসে ডিঙি বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে গেল। খালটা যেখানে নদীর মুখে পড়েছে ডান দিকের শুক্‌নো বালির চড়ায় সমস্ত ডিঙি উপুড় করে ফেলে রাখা হয়েছে। কড়া রুদ্দুরে নৌকোর তলাগুলি ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। ডাকু একদিন লুকিয়ে দেখে এসেছে।

যে নৌকোর তলা জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে কত কথা কানাকানি করতে করতে খিড়কীর পুকুর থেকে খালের বাঁকে—আবার খালের বাঁক থেকে মাঝ দরিয়ায় সাঁতার কেটে বেড়াত তার বোধকরি সকল কথা জন্মের মত বন্ধ হয়ে গেছে। কাঠ ফাটা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে ডাকুর মনে হল—ডিঙিটার আকণ্ঠ তেষ্টা পেয়েছে।

এই ছোট ডিঙিই এতদিন কত রোগীর কত ঔষধ জুগিয়েছে, কত পথিককে পার করে দিয়েছে, কত চিঠি ডাকঘরে ফেলেছে, কত ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন জুগিয়েছে—সংবাদ বহন করে কত জনকে দিয়েছে তৃপ্তি। আজ কেউ তাকে ডেকেও জিজ্ঞেস করেনা।

ডিঙি নেই, তাই গোটা গাঁয়ে ডাকুর দাম আজ একটা কানা-কড়িও নয়।

নাইবা থাক্‌লো দাম।

কিন্তু ডিঙিটা যে প্রচণ্ড রৌদ্রে হাঁফাচ্ছে। সারা জীবন ধরে এত বোঝা বইল, কণ্ঠটা রুদ্ধ হয়ে যাবার আগে কেউ কি তার কাছে এক ঘটি জলও এগিয়ে দেবেনা?

আত্মার মুক্তি

প্রাচীনকালে এক অত্যাচারী রাজা ছিল।

কারো মধ্যে কোন ভাল গুণ দেখলে সে রাজা রাত্তিরে ঘুমুতে পারত না, দুস্বপ্ন দেখে কেবলি চম্‌কে চম্‌কে উঠত।

ভাই যদি ভাইকে ভালবাসত, বাবা ছেলেকে যদি স্নেহ করত, মা যদি নিজের সন্তানকে কোলে করে খাওয়াত, তবে এই অত্যাচারী আর হিংসুটে রাজার মনে আগুন জ্বল্‌তে থাকত।

মানুষের আত্মা আর বিবেককে সে টুঁটি টিপে মেরে ফেলতে চাইত।

তার রাজ্যে সবাই মিথ্যেবাদী হোক, লোককে হিংসে করুক, খুন-জখম করুক, ঈশ্বরকে না মানুক···আর সব সময় রাজার বশ্যতা স্বীকার করুক—এই ছিল সেই অত্যাচারী রাজার কামনা।

রাজার আদেশে শয়তান গুপ্তচরেরা ছদ্মবেশে সারা দেশময় ঘুরে বেড়াত।

যদি তারা দেখত, ভায়ে ভায়ে মিলেমিশে এক সঙ্গে বাস করছে···অমনি তাদের মাথার টনক নড়ত! তারা টাকা-পয়সার লোভ দেখিয়ে পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বাধিয়ে দিত। পরে দেখা যেত, যে-ভাইরা একে অন্যকে না দেখে থাক্‌তে পারত না—তারাই লোভে আর হিংসায় একজন আর একজনের টুঁটি টিপে ধরেছে!

যদি শয়তান গুপ্তচরেরা কোথাও দেখত যে, ছেলেরা মা-বাবার কথা মেনে চল্‌ছে, সবাই শিক্ষা লাভ করছে···সংসারে রয়েছে

শান্তি তখুনি তারা ফুস্-ফুস্ করে ছেলেদের কানে কি মন্তর দিত।

তারই ফলে দেখা যেত ছোটরা আর বড়দের সম্মান দিচ্ছে না, উদ্ধতভাবে কথা বলছে। বড়রা ছোটদের যে শিক্ষা দিতে চাইছে, ছোটরা তা কানে নিচ্ছে না! সবাই বলছে, আমিই বড়, অন্যের কথা আমি শুনব কেন? এইভাবে ঝগড়া মারামারি আর অশান্তির সৃষ্টি হতে থাকল।

মন্দবুদ্ধি গুপ্তচরের দল -দেশের ছেলেদের শেখাতে লাগল - বুড়ো মা-বাপকে আর খেতে দিতে হবে না। ওদের ধরে নিয়ে পিঁজরে পোলে গরু-ছাগলের মত আটকে রাখলেই হবে। দেশের রাজা ওদের দানা-পানির ব্যবস্থা ক'রবে। তোমরা শুধু রাজাকে কাঁড়ি-কাঁড়ি খাজনা জুগিয়ে যাও।

এই রাজ্যে কয়েকজন প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা লোকালয় ত্যাগ ক'রে পর্বতের গুহায় নির্জনে বসে ধ্যান-ধারণা করছিলেন!

তাঁরা দেখতে পেলেন দেশ ক্রমশ রসাতলের দিকে যাচ্ছে। দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা সবকিছু মানুষের অন্তর থেকে লোপ পেয়ে যাচ্ছে। মানুষ জন্তু-জানোয়ারের মত হিংস্র হয়ে পরস্পরের টুঁটি কামড়ে ধরছে। মানুষের আত্মা অসহ্য ব্যথায় গুমরে কাঁদছে। বোধকরি মানুষের মন আস্তে আস্তে পাথর হয়ে যাবে।

সেই জ্ঞানীদের মধ্যে ছিলেন একজন সর্বকালজ্ঞ ঋষি। তিনি যোগবলে মানুষের আত্মাকে একটি পাখীতে রূপান্তরিত ক'রে নিজেদের গুহায় লুকিয়ে রাখলেন। কিন্তু সেই পাখী এমন করুণ

সুরে গান গাইতে লাগল যে, সেই দুষ্ট রাজার আর রাত্তিরে ঘুম আসে না!

অস্থির হয়ে উঠল সেই হিংসুটে রাজা। তখন সে গুপ্তচরদের আদেশ দিল, যে ক'রে হোক—এই পাখীকে তোমরা ধরে নিয়ে এস—নইলে আমি ঘুমুতে পারছি না। ওই পাখীর কান্নায় আমি দুই চোখের পাতা এক করতে পারছি না।

দলে দলে চারদিকে ছুটল সেই গুপ্তচরের দল। একজন সন্ধান পেল—পাহাড়ের ওপরে এক সন্নাসীর গুহায় সেই পাখীটি গান গাইছে।

গভীর রাত্রে চুপি চুপি পাহাড়ের পথ বেয়ে সেই শয়তান পাখীটিকে চুরি করবার জন্য অগ্রসর হ'ল।

সবকালজ্ঞ ঋষি সে কথা ধ্যানযোগে জানতে পেরে পাখীটিকে একটি ছবিতে রূপান্তরিত করে পাহাড়ের গুহার গায় এঁকে রাখলেন।

শয়তানটা এসে দেখে—পাখী কোথায়ও নেই, কিন্তু সেই করুণ সুরের গান একটি ছবি থেকে বেরিয়ে আসছে।

শয়তান গুপ্তচরটা সেই আজব কথা রাজাকে গিয়ে জানাল।

রাজা তখন না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেছেন চীৎকার করে আদেশ দিলেন, একদল মিস্ত্রিকে নিয়ে যাও- তারা গুহার সেই অংশটা কেটে পাখীটাকে বন্দী ক'রে নিয়ে আসবে রাজপ্রাসাদে।

রাজার আদেশ তো আর অমান্য করা চলে না!

স্বপনবুড়োর ঝুলি

যেখানে পাখীর ছবিটা আঁকা ছিল—মিস্ত্রিরা পাথরের একটা বিরাট অংশ শাবল দিয়ে ভেঙে নিয়ে চলে এল।

কিন্তু মুস্কিল হ'ল এই যে, গভীর রাত্রে সেই পাখীটা মূর্তি ধরে করুণ সুরে গান গায়। তাতে রাজা কিছুতেই ঘুমুতে পারেন না! চোখ একেবারে জবা ফুলের মত লাল হয়ে গেল, ভীষণ মাথার যন্ত্রণা···রাজা একেবারে শয্যাগত হয়ে পড়লেন।

রাজার আদেশে পাখীটাকে মুছে ফেলবার চেষ্টা করা হ'ল। রাজার অনুচরের দল যত ঘসুক না কেন—সেই পাখীর ছবি পাথর থেকে কিছুতেই ওঠে না!

শাবল দিয়ে ক্রমাগত আঘাত করা হ'ল কিন্তু পাথরও ভাঙে না।

রাজা আরও অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বিছানা ছেড়ে ওঠবার তার ক্ষমতা নেই।

রোজ রাত্তিরে সেই পাখীর গান শুনে রাজ্যের লোক বুঝতে পারল তারা কোন্ ভুল পথে চলেছে।

সবাই তখন সঙ্ঘবদ্ধ হ'ল।

ঠিক ক'রল, একদিন রাজপুরী আক্রমণ ক'রে সেই পাথরশুদ্ধ পাখীটাকে সবাই মিলে ছিনিয়ে আনবে।

কিন্তু রাজার সৈন্যেরা অস্ত্রবলে সকল লোককে হটিয়ে দিল।

দেশ জুড়ে কান্নার রোল উঠল।

মানুষ-মানুষকে বিশ্বাস ক'রতে চায় না।

তখন সেই ত্রিকালজ্ঞ ঋষি দেখ্‌লেন যে, দেশ নরকে পরিণত হতে চলেছে!

তখন তিনি উদাত্ত-কণ্ঠে এক মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন। ধীরে ধীরে পাথর থেকে সেই পাখী জীবন্ত হয়ে গান গাইতে গাইতে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে চলে এল।

সবাই অনুভব ক'রলে যে, তারা তাদের আত্মাকে ফিরে পেয়েছে।

দেশশুদ্ধ লোক এখন সেই ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষের জয়ধ্বনি ক'রে উঠল।

সেই সময় খবর পাওয়া গেল যে, অত্যাচারী রাজা সেই সমবেত জয়ধ্বনি শুনে প্রাণত্যাগ করেছে!

এইবার নতুন করে আত্মার হল মুক্তি।

মানুষ আবার মানুষকে ভালবাসতে শিখল।

মাটি-মা

মধুতুলসী গাঁয়ের জনার্দন মোড়লের একমাত্র ছেলে বৈকুণ্ঠ যেবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করলে, জনার্দন হাঁক-ডাক পেড়ে, হৈ চৈ ক'রে পাড়ার দশজনকে ডেকে, একেবারে যজ্ঞি-ব্যাপার জুড়ে দিলে।

মোড়লগিন্নি বললে, "ছেলে পাস দিয়েছে ব'লে সাপের পাঁচপা দেখেছ নাকি? টাকাগুলোকে এমন ক'রে নয়-ছয় করছ কেন? পাসই দিক আর যাই করুক—ও তো আমাদের সেই বোকুই আছে শেষ পর্যন্ত সেই লাঙলই তো ধরতে হবে। মিছিমিছি এত হুল্লোড় ক'রে মরছ কেন?"

হুঁকো টান্‌তে টান্‌তে, আধবোঁজা চোখ না খুলেই, বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে জনার্দন মোড়ল জবাব দিলে, "তুমি বোঝো না, গিন্নি। বৈকুণ্ঠ আমাদের গাঁয়ের মুখ আলো ক'রে দিয়েছে। ও কি আর যে-সে পাস!"

এর আগে মধুতুলসী গাঁয়ে কেউ পাঠশালার গণ্ডীই পেরোতে পারে নি—সেখানে কিনা একেবারে ম্যাট্রিক-পাস! জনার্দন মোড়লের অতি উল্লাসকে দোষ দেয়া যায় না! কিন্তু তাই ব'লে যাত্রা, পাঁচালী, তরজা এ সবের পেছনে টাকা খরচ করা, আর গাঁয়ের লোকদের খাওয়ানো-দাওয়ানো...ব্যাপারটা মোড়লগিন্নির আদপেই ভাল লাগে নি।

তাই বৈকুণ্ঠের মা আবার ভাল ক'রে মনে করিয়ে দিলে, "দেখ,

কুঁজোর জল গড়িয়ে খেলে আর ক'দিন? তবু যদি বুঝ্‌তাম যে, ছেলে ভাল রোজগার করতে শিখেছে, তা হ'লে না হয় একটা কথা ছিল। টাকাকড়িকে এমন ক'রে খোলাম কুচি ভাবতে নেই! তাতে মা লক্ষ্মী রুষ্ট হন।"

জনার্দনকে কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত দেখা গেল না। গুড়ুক গুড়ুক তামাক টানতে টানতে বললে, "হুঁ,। তোমার যেমন কথা গিন্নি! গাঁয়েব মধ্যে বৈকুণ্ঠ রোজগার করবে না তো, কে করবে শুনি? পেটে ধরলেই ছেলেকে চেনা যায় না। ওকে আমি লাঙল ধরতে দেবো মনে করেছ? যাও যাও—হাঁড়ি ঠেলতে এসেছ, হাঁড়ি ঠ্যালো গে যাও।"

জনার্দন মুখে চোখে বিশেষ রকম বিরক্তি ফুটিয়ে তুললে।

মোড়ল গিন্নি গজ-গজ করতে লাগল, "লাঙল ধরবে না! একেবারে লাটসায়েব হয়ে গেছেন আর কি! আমার শ্বশুর লাঙল ধরেছে, সোয়ামী লাঙল ধরেছে, আর পেটের পুত সায়েব হয়ে গেছে! কপালে অনেক দুর্গতি না থাক্‌লে কেউ এমন কথা মুখে আনে? শুনলে মা লক্ষ্মী মুখ ফিরিয়ে নেন না?"

মোড়ল এ-কথাতেও উত্তেজিত হ'ল না। শুধু হাস্‌তে হাস্‌তে বললে, "অনেক পড়াশুনোয় বৈকুণ্ঠের শরীরটা কাহিল হয়ে গেছে। ও দিদির বাড়ি থেকে ঘুরে আসুক ক'দিন। জায়গাটাও ভাল, দুধ-দই, পুকুরের মাছ—বাড়ির চেয়েও সেখানে অঢেল।"

গিন্নি বুঝতে পারল, ছেলেকে নিয়ে ট্যাক্‌ট্যাক্ করা পছন্দ নয় মোড়লের।

বৈকুণ্ঠও তাই চায়। শহর থেকে নতুন কেনা জামা আর জুতোর

সদ্‌ব্যবহার করা যাচ্ছে না এখানে। গাঁয়ের পথে চলতে কেমন যেন বাধো বাধো ঠ্যাকে। হয়তো পা মচ্‌কে হোঁচট খেয়েই পড়বে! এখানে নতুন জুতো-জামা প'রে পথে বেরোলেই, সমবয়সীরা টিটকারি দেয়—"অনভ্যেসে চন্দনের ফোঁটা কপালে চচ্চড় করে।"

ব্যাগের মধ্যে জিনিসপত্র গুছিয়ে বৈকুণ্ঠ যেদিন পিসীর বাড়ি রওনা হ'ল, সেদিন সন্ধ্যে থেকেই একটা কালো বেড়াল বাড়ির আনাচে-কানাচে কেবলই ম্যাও—ম্যাও ক'রে অকল্যাণ ডেকে ফিরতে লাগল। নিশুতি রাতে একটা কালপ্যাঁচা ডাকতে লাগল নারকেলগাছের মাথায় ব'সে। তাড়িয়ে দিতে প্যাঁচাটা উড়ে গেল বটে, কিন্তু মোড়ল গিন্নির মনটা মুশ্‌ড়ে রইল।

সারাদিন দিব্যি ভাল মানুষ জনার্দন মোড়ল; কিন্তু হঠাৎ শেষরাত্তির থেকে এমন ভেদ-বমি শুরু হ'ল যে, কয়েক বারের পরেই তার কথা বন্ধ হয়ে গেল!

সনাতন কোব্‌রেজ বালাপোষ গায়ে দিয়ে এসে নাড়ি দেখলেন পেট টিপলেন, জিব দেখলেন, চোখের কোণ ফাঁক ক'রে অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর মন্তব্য করলেন, "শিবের অসাধ্য ব্যাধি।"

মোড়লগিন্নি শহরে লোক পাঠিয়ে ডাক্তার ডাকালেন।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। পরদিন বেলা বারোটার মধ্যেই জনার্দন মোড়ল সংসারের হিসেব-নিকেশ অসমাপ্ত রেখেই পরপারের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমালেন।

লোক গেল খবর নিয়ে। তার সঙ্গে বৈকুণ্ঠ যখন বাড়ি ফিরে

এল, তখন রাত হয়ে গেছে। আশ্বস্ত হ'ল সবাই—বাসি-মড়া হ'ল না যাহোক।

ছেলের সঙ্গে মায়ের প্রথম মতান্তর হাল শ্রাদ্ধের ব্যাপার নিয়ে।

ছেলে বললে, তার বাপ ছিল গাঁয়ের মোড়ল ; আর তা ছাড়া সারা গাঁয়ের মধ্যেই সে-ই প্রথম ম্যাট্রিক-পাস করেছে, সুতরাং বাপের শ্রাদ্ধ ঘটা ক'বে করতে হবে।

মা জবাব দিলে, "নয়-ছয় ক'রে সব উড়িয়ে দিলে তো চলবে না। বাপ তোমার জন্যে কী রেখে গেছে, আগে ভাল ক'রে খতিয়ে ছাখ। সাধারণ-ভারে বাপের শ্রাদ্ধ-শান্তি শেষ কর—তার পর লাঙল নিয়ে মাঠে বেরোও।"

কিন্তু মায়েব কোন কথাই ছেলের কানে মধুবর্ষণ করল না। তার বাপ মারা গেছে---এ-কথা যদি ফলাও ক'রে সারা গায়ে জানামোই না হ'ল, তবে বাপের ম'রে লাভটা হ'ল কী ?

মায়ের পরামর্শ বৈকুণ্ঠ একান্তভাবে বাহুল্য মনে করল।

একদল শুভানুধ্যায়ী বন্ধু-বান্ধবও জুটে গেল এ-সময়। তারা সৎ-পরামর্শ দিলে—ছেলে যদি বাপের সুনামই বজায় রাখতে না পারে, তবে লোকে সে-ছেলেকে বলে বংশের কুলাঙ্গার। গাঁয়ের মোড়লের শ্রাদ্ধ ঘটা ক'রে না করলে, পাস-করা ছেলে দশের কাছে মুখ দেখাবে কী করে ?

বন্ধুদের পরামর্শে বৈকুণ্ঠ সবার আগে মায়ের গয়নাগুলো বিক্রি করে ফেললে। বিধবা হয়েছে মা, গয়না রেখে করবে কী ?

কলকাতা থেকে এলোকেশীর কেত্তনের দল না নিয়ে এলে

শ্রাদ্ধ জম্‌বে কী ক'রে? বাড়িতে ভিয়েন বসাতে হবে,—নিজ গ্রাম ছাড়া, আশপাশের গাঁয়ের লোককেও নেমন্তন্ন ক'রে দেখিয়ে দিতে হবে—শ্রাদ্ধ কা'কে বলে!

বৈকুণ্ঠের মনে হতে লাগ্‌ল যে, বাবা এই-সময় আচ্‌মকা ম'রে গিয়ে ওকে বিরাট একটা কাণ্ড-কারখানা করবার সুযোগ দিয়ে গেছে।

ছেলের এলাহি কারবার দেখে মায়ের মুখের কথা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে! কে যেন বোবাকাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছে তার মুখে। শ্রাদ্ধের আনুষ্ঠানিক কাজগুলো হাতে হাতে করা ছাড়া মা ছেলেকে কোন কথা একবার জিজ্ঞেসও করতে আসছে না। কিজানি কোন্ দিক থেকে আবার নতুন ক'রে আঘাত আস্‌বে!

শ্রাদ্ধের ফলার খেয়ে পেটুক বামুন থেকে ভুঁড়েল চাষী পর্যন্ত একেবারে ধন্যি-ধন্যি করতে লাগল। বন্ধুর দল বৈকুণ্ঠের পিঠ চাপ্‌ড়ে তারিফ্ ক'রে বললে, "আরে, ভাই, বাপ তো মরে অনেকেরই, কিন্তু এমন শ্রাদ্ধ করতে পেরেছে এ গাঁয়ে কোন্ বাপের ব্যাটা!"

বাপ যেন রাজত্ব রেখে গেছে—বৈকুণ্ঠর ভাবখানা এইরকমই। শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে গেলে সে সংসারে হাত দিলে। প্রথমেই সে বৈঠকখানা ঘরটা তক্তপোষ আর টেবিল-চেয়ার পেতে ভাল ক'রে সাজিয়ে ফেললে। জনার্দন মোড়লের আমলে এই-ঘরটাতে গোরুর রাখাল-ছোঁড়া একদিকে শুয়ে থাকত, আর-এক-দিকে বাইরের লোক এলে শোবার ব্যবস্থা ছিল, আর ছিল তামাকের সাজ-সরঞ্জাম। রাখাল-ছোঁড়াই প্রত্যহ ঘরটাকে পরিষ্কার রাখ্‌ত আর মোড়লের তামাক সাজত।

স্বপনবুড়োর ঝুলি

বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে থিয়েটারের দল করল বৈকুণ্ঠ। রোজ সন্ধ্যে হ'লেই বাঁয়াতবলায় চাঁটি, হারমোনিয়মের প্যাঁ-পোঁ আর বেহালার তানে পাড়ার লোক সচকিত হয়ে উঠ্‌ল, আর অন্দরে মোড়লগিন্নি নীরবে চোখের জল ফেল্‌তে লাগল।

সখীর দল জোগাড় করতে বৈকুণ্ঠকে এপাড়া-ওপাড়া, এ গ্রাম-সে গ্রাম ঘোরাঘুরি করতে হয় —তাই সে হঠাৎ একদিন একটা সাইকেল কিনে নিয়ে এল।

মা জিজ্ঞেস করলে, "হ্যাঁ রে, আমাদের এমন দুঃসময় যাচ্ছে, তার ওপর তুই একটা সাইকেল কিনে নিয়ে এলি ?"

বৈকুণ্ঠ জবাব দিলে, "সে তুমি বুঝ্‌বে না, মা। আমার এখন কত কাজ! পাড়ার লোকেরা আমাকে থিয়েটারের ডিরেক্টার করেছে। সব দায়িত্ব তো আমারই। বাবা ছিল গাঁয়ের মোড়ল, আর, আমি হলাম ডিরেক্টর।"

এক বিঘে জমি বিক্রি হয়ে গেছে—সাইকেল কেনার আড়াইশ' টাকা জোগাড় করতে, বৈকুণ্ঠ না বললেও তার মা তা' টের পেয়েছে।

মোড়ল গিন্নির বুক ঠেলে দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল। এই জমিই ছিল জনার্দন মোড়লের প্রাণ। গতবার যখন অগ্রহায়ণ মাসে ধান পেকে উঠেছে মোড়লের সঙ্গে মোড়লগিন্নি গভীর রাত্তিরে ধান-ক্ষেত দেখতে বেরিয়েছে। চাঁদের আলোর জোয়ার বয়ে যেত, আর এলোমেলো বাতাস যখন সোনা-রঙের পাকা ধানের ক্ষেতে ঢেউ তুল্‌ত, স্বামী-স্ত্রী মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকৃত—চোখের পলক আর পড়্‌ত না। মোড়লগিন্নি মা-লক্ষ্মীর পায়ে মনে মনে

প্রণাম ক'রে বল্‌ত—"এমনি দয়া যেন মা তোমার চিরকাল থাকে।"

মোড়লের ক্ষেতের ফসল দেখবার জন্য সারা গাঁয়ের লোক ঝুঁকে পড়ত। কতবার সরকারী পুরস্কার পেয়েছে মোড়ল—নতুন বীজ পাঠিয়ে দিয়েছে সরকার মোড়লকে! সেই সোনা-ফলানো জমির এক বিঘে ছেলে বিক্রি ক'রে দিলে, মাকে একবার জানাবারও দরকার মনে করে নি!

হাল থেকে ছাড়িয়ে এনে, হাট থেকে পাক্‌ড়ে ধরে, দোকান থেকে খোশামোদ ক'রে বেশ কয়েকটা ছোক্‌রা জুটে গেছে। তারা গলাফাটা চিৎকারে সখীর গান দোরস্ত করছে। তাদের জন্যে মাঝে মাঝে মারা হচ্ছে খাসি, পাঁঠা, ভেড়া—! মোড়লের পাঁঠা-ভেড়া-খাসির পাল নিঃশেষ হতে লাগল।

এরপর হাত পড়ল দুধোলো গাইতে। একটা হাত-ঘড়ি কিন্‌তে হবে। পুরোনো হারমনিয়ামটা সেকেলে ধরণের—নতুন ধরণের একটা চাই। স্টোভ একটা কেনা দরকার—নইলে মহড়া দিতে দিতে চা-পানের অসুবিধে হয়। মোড়লের আমলে মুড়ি-গুড়ই এ বাড়িতে সুখাদ্য ব'লে বিবেচিত হত।

মোড়ল গিন্নি একদিন ছেলেকে ডেকে বললেন, "বাবা, আমাকে না হয় কাশী রেখে আয়। এখানে আমার আর মন টিকছে না।

ছেলে বললে, "সে কী কথা! আমাদের থিয়েটার না দেখে যাবে কী?"

মা লক্ষ্য করলেন, তাঁর চ'লে যাওয়ার প্রস্তাবে কোন আপত্তি তুলল না ছেলে।

স্বপনবুড়োর ঝুলি

তাঁর ধারণা ছিল, ছেলে কিছুতেই মাকে যেতে দিতে চাইবে না। এই অবহেলা মা'র বুকে কাঁটা হয়ে বিঁধে রইল। থিয়েটার দেখানোর জন্যেই যা কিছু আগ্রহ, নইলে মা বাড়ি ছেড়ে চলে যাক্—বৈকুণ্ঠের তাতে কোন আপত্তি নেই।

বুক ঠেলে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে মায়ের। এক এক সময় আবার শিউরে ওঠে মা। এতে তার ছেলের অকল্যাণ হবে না ত? নিজেকেই নিজে সান্ত্বনা দেয়,—না না, মায়ের দীর্ঘশ্বাসে কি ছেলেব অকল্যাণ হয় কখনও!

থিয়েটারের স্টেজ বাঁধ্‌তে হবে। কাউকে কিছু না জানিয়ে বৈকুণ্ঠ আরো কিছু জমি ছাড়িয়া দিলে। কিন্তু কথাটা গোপন রইল না—মা ঠিকই জান্‌তে পারলে।

মোড়ল গিন্নি ছেলেকে কিছু না ব'লে, নিজের কাছে যা সামান্য কিছু ছিল তাই সম্বল ক'রে, গাঁয়ের একটি ছেলেকে নিয়ে একদিন কাশী রওনা হয়ে গেল। মনে আশা রইল, ছেলে ছুটে গিয়ে নিশ্চয়ই তাকে ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু দিনের পর দিন কেটে যায়—মা অকারণে চোখের জল ফেলে! না আসে কোন অনুরোধ, না কোন চিঠি—না আসে ছেলে নিজে।

মা ভাবে, এখন মরণ হ'লেই বাঁচি!

এদিকে বৈকুণ্ঠ থিয়েটার নিয়ে আরো মেতে উঠেছে! আর দু'দিন পরে অভিনয় হবার কথা। গাঁয়ের লোককে দেখাতে হবে 'আলমগীর' নাটক। নাওয়া-খাওয়ারই সময় নেই বৈকুণ্ঠের—মায়ের কথা মনে পড়বে কী!

কিন্তু নাটক করতে চাই জমকালো সাজ-পোশাক। তার জন্য

চাই টাকা। অথচ, আর জমি বিক্রি করতে তার মনে বাধ্‌ল। ভাব্‌ল, ঘরের কিছু তৈজসপত্র ছাড়িয়ে দেবে। কী হবে এত সব থালা-বাসন রেখে! বৈকুণ্ঠ গেল বাজারতলায় কাঁশারির দোকানে কথা-বার্তা বলতে।

দুপুরবেলাই সে বেরিয়ে পড়ল,—বেলাবেলি আবার ফিরতে হবে; সন্ধ্যেবেলা এখন রোজই জোর রিহার্শেল দরকার।

কাঁশারিও চাষী-গৃহস্থ, তবে চাষ-আবাদেব জমি বিশেষ নেই; আজ ক'বছর ধ'রে এই দোকানেরই আয়ে সে কিছু কিছু ক'রে জমি বাড়াচ্ছে। বৈকুণ্ঠ যে-জমি বিক্রি করেছে, এই কাঁশারিই তা কিনেছে। এবার আর বৈকুণ্ঠ জমি বেচ্‌বে না শুনে সে খুশি হল না; কিন্তু বাসন-কোসনের কথায় একটা কথা মনে পড়তে তার দুটো চোখ জ্বল্‌জ্বল ক'রে উঠ্‌ল। সে বলল, "ঘরের বাসন-পত্তর ঘরেই থাক বাবাজি, আমিই বলছিলাম কী—তোমাদের সেই লক্ষ্মীমূর্তিটা আছে না পেতলের? সেটা ছাড়িয়ে দাও। ওর তো পূজো-আর্চ্চা হচ্ছে না—তোমার মা চলে গিয়ে অবধি।"

তা বটে। কিন্তু বৈকুণ্ঠের যে অনেক টাকা দরকার। ওটি বিক্রি ক'রে আর কত টাকা পাওয়া যাবে?

কাঁশারি বল্‌ল, "ঠাকুর পিতিমের দাম কি আর পেতল-কাঁসার ওজনদরে হয়, বাবা? আর, ও হচ্ছে কোন্ কালের সাবেকি বিগ্‌গেরো।"

বৈকুণ্ঠের বাবা একবার একটা নতুন জমি কিনে, তাতে হাল দিতে গিয়ে ওই পেতলের লক্ষ্মীমূর্তিটি পায়। বছরকার যত লক্ষ্মীপূজোর দিনে সেই থেকে ওতে পূজো হয়ে আসছিল, তা

ছাড়া রোজ মা তাকে গন্ধপুষ্প-ধূপদীপ আর যখন যা জুটত ফলভোগ দিত। মা চ'লে যাবার পর থেকে সে সব পাট উঠে গেছে। বৈকুণ্ঠ মানে না ওসব কুসংস্কার।

সবাই বলে, ওই লক্ষ্মী পাবার পর থেকেই নাকি লক্ষ্মী বাঁধা হয়ে ছিলেন জনার্দনের সংসারে! হাসি পায় বৈকুণ্ঠের। মানে না সে ওসব বাজে কথা। বোকা কাঁশারি যদি ওইটুকু পেতল নিয়ে অত টাকা দেয়, বৈকুণ্ঠের লাভই তাতে। খুশিমনেই সে বাড়ি ফেরার চেষ্টা করে, কিন্তু মুখে হাসি কেন ফোটে না, মনটা কেন কেবলই ওঠে ভারি হয়ে?

নীলমণিদের বৈঠকখানার পাশ দিয়ে ফিরছে বৈকুণ্ঠ, কানে এল, ঘরের ভেতর যেন থিয়েটারের কথাই চলছে হৈ চৈ সহকারে।

মজা করবার জন্য নিঃশব্দে সাইকেল থেকে নেমে বৈকুণ্ঠ দাঁড়াল গিয়ে বৈঠকখানার বাইরে। নীলমণি হচ্ছে থিয়েটারের বিরাট পাণ্ডা—বৈকুণ্ঠের শ্রেষ্ঠ বন্ধু। সে বলছে, "থাক্‌ত বাপের জমানো টাকা, তাই ভেঙে যদি লবাবি করতিস তো বুঝতাম যে, হ্যাঁ, বড়লোক। জমি বেচে, গয়না বেচে, তৈজস বেচে থেটারের টাকা জোগাচ্ছিস, তোর বড়মানুষির ক্যাথায় আগুন। শেষ যেদিন কাঁথা-কাপড় বিক্রি করতে নামবি, কুলোব বাতাস দিয়ে সেদিন গাঁ থেকে বের ক'রে দেবো।"

একজন ঠাট্টা ক'রে বললে, "বাবু ম্যাট্‌ট্রিবিক পাস দেছেন, গাঁয়ে থাকবেন কী গো। চাকরি করতে যাবেন বাবু কল্‌কেতা-শহরে।"

"ছোঃ ছোঃ!" নীলমণি বলল, "ম্যাট্‌রিক পাস ক'রে আজ-

কাল বেয়ারার চাকরি জোটে না, জানিস ? কত বি-এ, এম-এ ফ্যা ফ্যা করে বেড়াচ্ছে, তার ম্যা-ম্যা-ম্যাট্রিক !"

নিঃশব্দেই চ'লে এল বৈকুণ্ঠ।

সন্ধ্যেবেলা রিহার্শেল দিতে এল সবাই। বৈকুণ্ঠ বলল, "সবাই চাঁদা দাও পাঁচ টাকা ক'রে ; তাই দিয়ে সাজপোষাক আসবে। থিয়েটারের আমি ডিরেক্টর ব'লে সবই আমায় দিতে হবে এমন কী কথা আছে ?"

সবাই ফিরে গেল, বলে গেল—ভেবে চিন্তে পরদিন জানাবে। কিন্তু জোর ক'রে কেউই বলে গেল না—চাঁদা দেবে।

সে-রাতে বৈকুণ্ঠের আর ঘুম আসে না। কেন যেন কেবলই ওর মায়েব মুখখানি ভেসে ওঠে। বড় করুণ সে মুখখানি। মায়েব পবনে ছেঁড়া ত্যানা ! শেষ রাতে ঘুম আসে তার চোখ জুড়ে। বৈকুণ্ঠ ঘুমিয়ে পড়ে। স্বপ্ন দেখল বৈকুণ্ঠঃ ভূমিলক্ষ্মী এসে ওর শিয়রে দাঁড়িয়েছেন। স্নিগ্ধ জ্যোতিতে ঘব ভরে গেছে। কিন্তু লক্ষ্মীর কপালে রক্তের দাগ !

ব্যস্ত হয়ে বৈকুণ্ঠ কী যেন জিজ্ঞেস করতে গেল ; কিন্তু মুখ দিয়ে তার কোন কথা ফুট্‌ল না।

ভূমিলক্ষ্মী কথা কইলেন।

মনে হল যেন এক সঙ্গে বীণা-বেণু বেজে উঠ্‌ল। লক্ষ্মী বললেন, "তুমি তোমার বাপের হাত ধ'রে যখন ক্ষেতে যেতে, তখন তোমাদের ওপর ছিল আমার আশীর্বাদ। তোমার বাবার ছিল অদম্য উৎসাহ আর অসীম পরিশ্রম করবার ক্ষমতা। তাই আমি উজাড় ক'রে ঢেলে দিয়েছিলাম সোনার ফসল তার ক্ষেতে।

কিন্তু বাপ মাবা যাবার পরই তুমি অমানুষ হয়ে গেলে! মা চ'লে গেল বাস্তুভিটে ছেড়ে চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে! তাকে একবার ডেকেও ফেরালে না। একে একে জমিগুলি ছেড়ে দিতে লাগ্‌লে। আঘাত পেলাম আমি। তাইতো আমার কপালে রক্তের দাগ দেখ্‌তে পাচ্ছ। এখনও যদি তুমি জমিব মর্ম বোঝো, তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়, হাল চালিয়ে, সার দিয়ে, বীজ বুনে, জল সেচে আবার তাব বুকে ফসল ফলাতে পারো, তবেই আমি তোমার বাস্তুভিটায় থাকব। নইলে এখানে আর আমি পা রাখ্‌তে পারছি নে। বড় জ্বালা এখানকার মাটিতে, আমার পায়ে ফোস্কা পড়ছে। তোমার মায়ের পূজোয় খুশি হয়ে বলেছিলাম, চিরকাল তাঁর বাঁধা হয়ে থাক্‌বো ; কিন্তু তাঁকে ছেড়ে দিয়ে তুমি আমাকেও বিদায় দিতে চলেছ ? মাটি-মাকে ভুলেই তোমার এই দুর্গতি। মায়ের হাজাব কাজ থাক্‌লেও যেমন দুরন্ত শিশু তার বুকে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে বুকের সুধা পান করে, তেমনি কৃষাণকে ছুটে যেতে হবে—মাটি-মায়ের বুকে। সেখানে হাল চালিয়ে জমি চষতে হবে, উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হবে ; তবেই না মাটি-মা খুশি হয়ে সোনালি ধানে ক্ষেত ভরে দেবে! সেই মাটি-মাকে তুমি ভুলেছ! অভাগা তুমি!"

আচম্‌কা ঘুম ভেঙে গেল বৈকুণ্ঠের! ভাবলে, এক নিছকই স্বপ্ন! তাড়াতাড়ি শয্যা ছেড়ে বাইরে এল বৈকুণ্ঠ। শিশির-ধোয়া জমি যেন তাকে মায়ের আদরে হাতছানি দিয়ে ডাক্‌ছে।

অনেক কাল মায়ের আদর পায়নি সে। তাই আদর-লোভী

ছেলের মত সে এগিয়ে গেল। পূব আকাশে শুকতারা তখন জ্বল্‌জ্বলে প্রদীপ ধরেছে।

লোকে বলে ভোরের স্বপন সত্যি হয়। সে মাকে ফিরিয়ে আন্‌বে—তারপর ফিরে যাবে তার ভুলে-যাওয়া মাটি-মায়ের নরম বুকে ; কাঁধে থাকবে ঠাকুর্দার আমলের হালখানি !

অরণ্যের কানাকানি

অরণ্যের কানাকানি শুনেছ কি নীরব সন্ধ্যায় ?
বনানী-বিহগদের নীড় পানে যবে মন ধায় ?
একা একা বসেছ কি—ঝিঁ-ঝিঁ ডাকা শাল-বন তলে ?
মনের স্ফুলিঙ্গ সম যেথা শুধু জোনাকিরা জ্বলে ?
যেখানে পরীরা আসে, শুনেছ কি নূপুরের ধ্বনি ?
তৃণদল শিহরণে প্রজাপতি ওঠে রণরণি !
স্তব্ধ সেই সন্ধ্যা রাতে বসেছ কি অরণ্যের কোলে ?
চুপি চুপি পাতা ঝরে, না-বলা-কী সুর এক দোলে !

কাল রাতে আমি ছিনু অরণ্যের মর্মমাঝে একা···
মনে মনে আশা ছিল—বুঝি পাবো পরীদের দেখা !
তারার কাঁপন-লাগা, আধো ঘুমে, আধো জাগরণে—
অরণ্যের আত্মা যেন ডাক দিল অঙ্গুলি হেলনে !
কচি কিশলয়ে জাগে মর্মরিত এ কিরে হিল্লোল !
মনের ময়ূর বুঝি রঙীন পাখায় দিল দোল !

বন-পতঙ্গের পাখে—জাগিল কি নূতন ইসারা ?
আমি একা বসে আছি···শির 'পরে জ্বলে কোটি তারা
অকারণ ঝরে পড়ে টুপ্ টাপ্ বনের কুসুম···
মন মোর একা জাগে চোখে নাই এক ফোটা ঘুম !

স্বপনবুড়োর ঝুলি

মনে হল পরী নাচে, আশে-পাশে, নিকটে ও দূরে—
অরণ্যের মৃদু হাসি জেগে ওঠে নব এক সুরে !
কদম্বের শিহরণ অনুভব করেছ কি মনে ?
ভীরু-লতা দোল খায়, নিজেরে সে অসহায় গনে !
কোথা কোন বন-পাখী সঙ্গোপনে একা দেয় শিষ—
ম্লান জ্যোছনায় জ্বলে মণি শিরে শুধু আশীবিষ !
থমকি দাঁড়ায় দূরে স্তব্ধ রাতে বনের হরিণী—
ওরে বুঝি সাড়া দিল পরীদের হাতের কিঙ্কিণী !
ছায়া আর জ্যোছনায় মরি মরি একি আলিপনা !
শব্দহীন সরোবরে ডুব দিয়ে শুধু কাল গনা !
শাল বনতলে শুয়ে একা আমি তারা ভরা রাতে
অরণ্যের কানাকানি শুনি যেন কার ইসারাতে !

এত সুখ ময়না !

খোকা-খুকু ভাইবোন
একা থাকে বাড়ীতে
আছে কত খেল্‌না—
সন্দেশ হাঁড়িতে !
দাঁড়ে আছে কাকাতুয়া
টিয়া আর ময়না…
খোকা-খুকু পরায়েছে
তাদেরকে গয়না !
আছে যে বেড়াল পুষি
ভুলো আছে কুকুরই
কেবল পাহাড়া দেয়
রাত-দিন-হুকুরই !
চাকর রয়েছে জেনো
নাম তার দাম্‌ড়া…
দেখতে বেজায় কালো
গণ্ডার চামড়া !
খোকাদের বাগানেতে
কত আম ফলত
দাম্‌ড়ার খাওয়া ভাই
দুই হাতে চল্‌ত !

স্বপনবুড়োর ঝুলি

বাগানে গেলেই বলে
টক্ আম খেয়ো না···
মিছি মিছি জ্বরে ভুগে
কষ্টটা পেয়োনা !
আম যদি খেতে চায়
খোকা-খুকু বিকেলে
দাম্ড়া কেবলি কয়
এখুনি যে কি খেলে !
ভরা পেটে খেলে পরে
পেটটা যে ফাঁপবে—
ঘন ঘন বমি হবে
শুধু মাথা কাঁপবে !
মাংস যখনি আসে
ভুলোটারে খাওয়াতে
তাড়াতাড়ি দাম্ড়া যে
বাঁধে তারে দাওয়াতে।
চুপচাপ গোপনেই
করে নিজে রান্না
গপাগপ্ খেয়ে বলে
কেন পায় কান্না !
হাঁড়ি ভরা মালপোয়া
আছে, কত মিষ্টি,

স্বপনবুড়োর ঝুলি

দাম্‌ড়া দেয় না কারে
একা করে ফিষ্টি !
বলে, দেহে বল নেই,
মুখে নেই রুচি গো···
কবে ভাই মরে যাবো—
ভগবানে খুঁজি গো !
এ বাড়ীতে যত আছে
পশু আর পাখী গো
বলে, অনাহারে প্রাণ
কি করে যে রাখি গো !
একদিন রাত্তিরে
করে সবে যুক্তি—
দাম্‌ড়ারে দেবো সাজা
হল এই চুক্তি !
শিংয়ে যে গুঁতোয় গরু
খাবি খায় দাম্‌ড়া—
খোকা-খুকু হেসে খুন
খুশী হই আমরা !
উল্‌টে-পাল্‌টে পড়ে
দাম্‌ড়াটা গোয়ালে !
পৈতৃক প্রাণটারে
বুঝি আজ্ খোয়ালে !

স্বপনবুড়োর ঝুলি

অনাহারে কাঁদে দাঁড়ে
কাকাতুয়া ময়না…
ক্ষিদের জ্বালায় প্রাণ
তাদের ত' রয় না !
দাম্‌ড়ারে দেয় ওরা
নাক-কান কামড়ে
পাজি বলে, বাপ বাপ্‌ !
খেতে দেবো থামরে !
আস্তাবলের ঘোড়া
মেরে দিল চাঁটি ত'।
বলে, ওরে দাম্‌ড়া,
এ দাওয়াই খাঁটি গো !
গোটাগুটি তিন মাস
নিতে হবে শয্যা…
এত দিনে ওরে চোর
পাবি কিরে লজ্জা ?

ভুলো বলে এইবার
চোখ নেবে ঠুক্‌রে—
কেঁদে বলে দাম্‌ড়া
পাব্‌বা বড় দুখ্‌রে !

স্বপনবুড়োর ঝুলি

ছেড়ে দাও ভুলো ভাই,
রোজ দেবো পাঁঠা ত'
সারা দেহ ছড়ে গেছে
ফুটে আছে কাঁটা ত !
সেই থেকে একেবারে
ভালো হল দাম্‌ড়া
খোকা-খুকু দুধ খায়
খুশী হই আমরা···
হাততালি দিয়ে নাচে
ভুলো পুষি ময়না !
গরু ঘোড়া হেসে বলে,
এত সুখ সয় না !

তিন উৎসবের পত্র

আজ সব কাজ রইল পড়ে—সবাই তোলো ফুল,
সবার মনেই জ্বাল্‌বে আলো যেন না হয় ভুল।
বাসন্তী রঙ্-সাড়ী পরে বোনের দলে চলে,
ফুল তোলা আব মালা গাঁথা চল্‌ছে কুতূহলে !
শ্বেত চন্দন ঘষ্‌বে হাতে, সাজাও বরণ ডালা,
তিল, তুলসী, বেলের পাতা, নানান্ রঙের মালা !
কালির দোয়াত উল্টে দিয়ে দুধ দিয়ে তাই ভরো...
আজ প্রভাতে খাগের কলম বাগিয়ে সবাই ধরো—।
অঞ্জলি দাও সবাই মিলে বীণাপাণির পায়—
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালাও যদি আঁধার দূরে যায় !

*　　*　　*　　*　　*　　*

তেইশে জানুয়ারীর কথা আমরা সবাই স্মরি...
বীর নেতাজীর কথায় মোদের চিত্ত আছে ভরি
তাঁহার জনম দিনে মোরা বীরের পূজা করি—
ফিরবে কবে বীর নেতাজী ?　দুঃখ যাবে সরি

স্বপনবুড়োর ঝুলি

সুভাষ বসুর ছোট্ট মেয়ে অনিতা তার নাম…
দেশের মেয়ে ফিরলে দেশে—পুরবে মনস্কাম !
প্রণাম করি ভারত মায়ের সেরা ছেলের পায়…
যাঁহার ত্যাগে মায়ের পায়ের শেকল ছিঁড়ে যায়

* * *

স্বাধীনতার-দিবস-কথা মোদের মনে পড়ে—
হাজার মানুষ মুক্তি পেল বিপ্লবেরই ঝড়ে !
ছাব্বিশে সেই জানুয়ারী রক্ত-রেখা দিনে…
প্রতি বছর নতুন করে লই যে মোরা চিনে !
সোনারকাঠি, তিনটি দিবস তোমরা ভুলো নাকো—
তোমাদের ওই নতুন খাতায় সবাই লিখে রাখো !
হাজার-হাজার ভাই-বোনেরে প্রীতি জানাই ভাই—,
তোদের লেখা তোদের হাতে তুলে দিলাম তাই।

সাদা-কালো

শুধুই কি আর মন্দ দিয়ে মালাখানি গাঁথা ?
জড়িয়ে আছে মন্দ-ভালো, সাদা-কালোর পাতা।
ফুল কি রে ভাই অমনি ফোটে—
সুবাস কি তার অমনি ছোটে—
রঙীন কুসুম, কালো ভ্রমর প্রলাপ বকে যা-তা !

আলোর পাশে আঁধার আছে তাই ত বীণার সুর-
ঢেউয়ের দোলায়, সুরের ধারায় পরাণ ভরপুর !
রাধার পাশে কৃষ্ণ কালো—
তিন ভুবনের মন-ভুলালো
মন্দ-ভালোর নামাবলী সবার হৃদয় মাতা !

বসন্ত-উৎসব

ফাগুয়ায় রাঙা আকাশ ডাকিছে
সকল আগল খোল
বসন রঙীন হয়েছে আবীরে
ফিরে এলো ভাই দোল।
দলাদলি ভুলে গলাগলি কর
মন রাঙা হবে জানি তারপর
শুধুই রঙীন বসন আজিকে মনে নাহি দেয় দোল।
রাঙা মন নিয়ে ওরে শিশুদল, সকল বিভেদ ভোল॥

সারা বন রাঙা করেছে কুসুম, মিঠে রাখালের বাঁশী
সোনার কাঠির পরশে জাগিয়া দাঁড়া এসে পাশাপাশি
ছোঁয়া-ছুঁয়ি দোষ ভুলে যাবে ভাই,
রামধনু রঙে সবারে রাঙাই
গানে প্রাণে আজ জেগেছে জোয়ার
তোরা মুখখানি তোল,
মনের কালিমা ধুয়ে দিয়ে রঙে
ফিরে এলো ভাই দোল॥

সকলি যে লাগে ভালো

সকলি যে লাগে ভালো!
এ আঁধারে আর মিছে বসে থাকা, মাটির প্রদীপ জ্বালো
সেই আলো ধরে দেখি মুখখানি
পয়ারে-ছন্দে তাহারে বাখানি
তুমি যদি নাচো মধুর ছন্দে—দুই হাতে দিব তাল-ও।

সমীরণ এসে মৃদু গুঞ্জনে সুরের কাহিনী কয়—
পাখী নদী আর আকাশের তারা মুখ পানে চেয়ে রয়।
যদি থাকি ঘুমে, যদি জাগরণে,
মনে হয় যেন আছ মোর মনে
মৃদু হেসে তুমি আমার দু'হাতে প্রীতির পশরা ঢালো।

ঘরের ডাক

সারা বেলা ধরে বসে আছি বটছায়
কত যে মানুষ ফিরে এলো এই গাঁয়।
কেউ হাঁটা-পথে, কেউ গুণ টেনে যায়—
চেয়ে চেয়ে মনে কত সুর মুরছায়…
তবু যে আমার বাঁশরী বাজে না হায়!
ঝিলিমিলি রোদে—ছোট ছোট ছায়াগুলি—
কাঁথা বোনে কার চম্পক-অঙ্গুলি—
না গাওয়া সুরের ওঠে যেন ঢেউগুলি—
শেষ-বিহঙ্গ কুলায় ফিরিয়ে যায়
তবু যে আমার বাঁশরী বাজে না হায়
সন্ধ্যা-তারকা ওঠে গগনের কোণে
জানিনা কি কথা জেগে ওঠে ওর মনে!
কান পেতে সে যে তৃণের প্রলাপ শোনে,
সাঁঝের পিদিম যবে ডাকে ঘরে আয়
তখনি বাঁশরী ফুকারিয়া গান গায়॥

মহাত্মা গান্ধী

হিংসা কহিল, নত করো শির, হাতে মোর হাতিয়ার,
তব অহিংস-বাণীর উর্দ্ধে অস্ত্র যে ক্ষুরধার।
অহিংস বলে, প্রেমের বাণীতে সদা নীচু মোর শির –
পরশ-পাথরে তোমারো হৃদয় সোনা হবে জেনো বীর!
পুষ্প-পরশে লৌহ হৃদয় না টলে না কভু খোলে—
প্রেমের পূজারী চরম আঘাতে লুটায় ধরণী কোলে!
তনু-হারা হয়ে মহান্-আত্মা বাঁচিল বিশ্ব মনে
একটি হৃদয় কোটি দীপ হয়ে আলো দেয় জনে-জনে॥

ক্লান্ত

বন্ধুর পথে, পঙ্কিল মনে চরণ চলে না তার
কোন আঁধারের নিহিত গুহায় তব মন্দির দ্বার ?
অবিশ্বাসী এ হৃদয় আমার
আঁকা-বাঁকা পথে চলে বার বার
দুরন্ত বায় করে হায় হায়···এবার হবে কি হার ?

পথের প্রান্তে প্রতিটি চরণে কামনার ফণা দোলে,
আপনার কথা বেশী ভাবি তাই পরাণ তোমারে ভোলে !
কোথায় লুকালে তব বরাভয়
ধ্বনি শুনি কানে এই পথ নয়—
কুহেলী হইতে কোন্ খেয়া যায় জ্যোতির্ম্ময়ের পার ?

প্রীতি-ফাগুয়ার পরশ কোথায় ?

দোল এসে গেছে,—কোথা ওরে ভাই কুম্‌কুম্ গোলা রঙ্ ?
আমি শুধু একা দাওয়ায় বসিয়ে দেখি মানুষেব ঢঙ্ !
প্রীতি-ফাগুয়ার পরশ কোথায় ?
মন শুধু তাই করে হায় হায় !
হাসি মুখে নাহি কুশল শুধায়, জনে জনে রেগে টঙ্ !
আবির অভাবে মানুষের দল দেখ না সেজেছে সঙ !

কালো বাজারের যত কালি ছিল তাই গুলে সবে ছোটে,
মানুষের মনে যত বিদ্বেষ সবে এক জোটে লোটে !
প্রতিবেশী মনে নাই বিশ্বাস—
তাই ত' মানুষ হারায়েছে আশ্
প্রতিহিংসার কালো বিষ দিয়ে দোয়াতের কালি ঘোটে
এই মন্থনে মানুষের মনে শুধুই বেদনা জোটে !

স্বপনবুড়োর ঝুলি

প্রীতির-ফাগুয়া কোথা ওরে ভাই, কোথা ওরে কুম্‌কুম্‌ ?
কালি ও কাদায় পাড়ারে মাতায়,—চোখে নেই কারো ঘুম !
এত বিষ ছিল কার মন কোণে ?
কালীয়াদহের ঢেউ কে রে গোনে ?
অমানিশা জাগি আশিবিষ মুখে কৌতুকে খায় চুম্‌ ?
পঙ্কের মাঝে মানুষ মেতেছে,—তাই কি কালির ধূম ?

আমি বলি ভাই, এসোনা সবাই, মধু-প্রীতি সাথে মাতি,
রাঙা কুম্‌কুম্‌ ছড়ায়ে কেবলি মিতালির মালা গাঁথি
কেবা একা ওই রয়েছে গো দূরে !
তারে ডেকে আন্‌ মিলনের পুরে
সবারে বরিব—তাইত পরাণে রঙীন আসন পাতি—
আবিরে গুলালে ছন্দে ও গানে কাটুক ফাগুন রাতি !

সিংহ-বাহিনী

এসো মা দুর্গে, জগজ্জননী, সিংহ-বাহিনী মাতা—
দুঃখের বোঝা হল যে মা ভারী,—
এসো গো ভুবন ত্রাতা
আজো যে জগৎ অসুরের ভয়ে সারা,
দানব-দলনী বহাও রক্ত ধারা
এ কলুষে তব আসন হয়নি পাতা,
এসো মা, এসো মা, সিংহ-বাহিনী মাতা ॥

রক্ত বীজের বংশ হয়নি শেষ
তীক্ষ্ণ তোমার খড়্গ জননী, কর সবে নিঃশেষ।
আজো, গৃহ হারা তব সন্তান
কেমনে মা গাই আগমনী গান ?
বিবস্ত্রা নারী হেরিয়া আজিও বাসুকি নাড়েনি মাথা
এসো মা, এসো মা, সিংহ-বাহিনী মাতা ॥

আজো যে মা শুনি প্রবলের রোষে দুর্ব্বল কেঁদে মরে,
তোমার যতেক পুত্র-কন্যা পড়ে ওই ঘরে ঘরে।
আজও যে মেদিনী অপমান-ভীতা—
এসো মা, শোনাও জীবনের গীতা,
মারণ অস্ত্র এনেছে অসুর, দূর করো যতো বাধা,
এসো মা দুর্গে জগজ্জননী, সিংহ-বাহিনী মাতা ॥

শোনো মা দুর্গা

শোনো মা দুর্গা, জননী মোদের, সব দুর্গতি নাশো,
সন্তান তব কর-জোড়ে ডাকে—তাহাদের ভালোবাসো।
কাছে ডেকে সবে রাখো মাথে হাত,
তাদের জীবনে আসুক প্রভাত !
অসুর দলনী, বরাভয় দিয়ে শুধু মৃদু মৃদু হাসো !

অন্নপূর্ণা জননী যাহার—সে কেন ক্ষুধায় মরে ?
ভিখারী বাপের ছেলে তাই কিগো ক্রন্দন প্রতি ঘরে ?
বাণী ও কমলা তব দুই মেয়ে
সবাই তাদের পথ পানে চেয়ে—
সিদ্ধিদাতা ও দেব-সেনাপতি দেখিবার অভিলাষ-ও
সিংহবাহিনী, দাঁড়াও সমুখে, শুধু মৃদু-মৃদু হাসো।

তোমার আশিস্

তোমার আশিস্ অরুণ-কিরণ ধারা
সব মলিনতা নিমেষেই হয় হারা।
পুণ্য-আলোকে অবগাহি মন,
তোমার করুণা যাচে অনুখণ…
এ আধার মনে ফুটিল কি শুকতারা ?
তোমার আশিস্ অরুণ কিরণ ধারা

তোমার আশিস্ মায়ের স্নেহের কোল—
আধো-আধো ভাষে শিখালে কত কি বোল !
পঙ্ক ছাড়িয়া জেগেছে কমল,
পাপহীন প্রাণ আলো ঝলোমল
পুণ্য-পরশে ভেঙেছে পাষাণ-কারা।
তোমার আশিস্ পুণ্য-কিরণ ধারা !

তোমার জনম দিন

আজি তোমার জনম দিন !
রাঙা ঊষা তাই আবীর ছড়ায়, সমীরণে বাজে বীণ !
ফুলগুলি ফুটে ছড়ায় সুবাস
মনে হয় বুঝি আজি মধু মাস
ঝল্‌মলে সাজ, মধুর হাসিতে আঁধার হয় বিলীন !

তোমার জনম দিনের বাঁশরী করে মোরে ঘর ছাড়া···
বিহগ আজিকে নব সুরে গায়, শোনে আকাশের তারা।
জনম দিনের হাসি-খুশী-গান
আজীবন তব থাক্ অম্লান
কামনা জানাই, জীবনের তান যেন নাহি হয় ক্ষীণ
অসীম পুলকে, প্রাণের সলিলে তুমি উজ্জ্বল মীন !
আজি তোমার জনম দিন !

সবাই যদি বৈঠা ধরে

সবাই যদি বৈঠা ধরে চলবে গাঙে নাও—
হাল ধরেছে পাকা মাঝি, বইছে মধুর বাও!
তাল দিয়ে গা ভাটিয়ালী
কলধ্বনি উঠ্‌ছে খালি—
কেন তুমি প্রাণের ভয়ে এদিক-ওদিক চাও?

মাথার পরে গাঙ্‌-চিলেরা দেখায় সহজ পথ.
পার হবো ভাই খেয়া—যখন পুরবে মনোরথ।
নদীর জলে চাঁদের খেলা
হাল্‌কা মেঘে ভাসায় ভেলা
ঝড়ের মাতন লাগ্‌লে তুমি আপনি অভয় দাও

সূর্য ওঠার স্বপ্ন দেখিস্

যদি না সূর্য ওঠে, কুয়াশাতে ছায়রে গগন,
তোরা কি থাক্‌বি বসে--আসবে কবে সেই সে লগন !
উঠে আয় রাত্রি ঘোরে
দুর্বিপাকেই ডাক্‌ছে তোরে -
তোরা সব এক সাথে ভাই, থাক্‌বি প্রদীপ জ্বালায় মগন ॥

যদি না জ্বল্‌বে আলো আঁধার রাতে
সূর্য্য ওঠার স্বপ্ন দেখিস্ তারার সাথে।
সে রাতের কৃষ্ণাতিথি
আলোর তৃষায় জাগ্‌বে নিতি--
কুয়াশা যাবেই সরে, রঙীন ঊষা দেখ্‌বি তখন ॥

মেঘ মেয়েরা

মেঘ মেয়েরা ছড়ায় যে জল রূপোর ঝারিতে –
শীতল করে নে দেহ-মন পুণ্য বারিতে !
বৃষ্টি-ফাগে ভরল যে শির
আকুল হাওয়া হয় যে অধীর
ঝাপসা দেখি দুই নদী তীর
নীরব সারি যে !
মেঘ মেয়েদের ভিজল শাড়ী তাড়াতাড়িতে।

উতল হয়ে উঠল যে আজ নবীন কদম ফুল,
আনমনা ওই মেঘ মেয়েদের উড়ছে এলো চুল !
রঙীন পেখম ছড়ায় ময়ূর
স্বর্গপুরী আর কত দূর ?
সমীরণেই শুনি সে সুর
সাগর পাড়ি দে—
মেঘ মেয়েদের রূপোর ঝারি নেবো কাড়ি রে।

গোপাল ভাঁড়

ছেলেবেলা থেকে হাসির সঙ্গে যে নামটি মিশে আছে
আজ দেখি সেই গোপাল ভাঁড় যে, দাঁড়ায়েছে এসে কাছে !
নিশুতি রজনী, ঝরঝর জল, বাইরে ডাকিছে ঝিঁঝিঁ,
আমি একখানি বই হাতে ক'রে শুয়ে আছি মিছিমিছি
হঠাৎ আমার ঘরের পেছনে শুনি খলখলে হাসি···
তারপর ভাই হাসির সঙ্গে মিলে গেল তারি কাসি !
খক্‌খক্ করে কাসে কেরে ভাই ? ঠক্‌ঠক্ লাঠি ঠোকে
মনে ত' পড়ে না, ছেলেবেলা থেকে দেখেছি কখনো ওকে !
হ্যা, হাঁা, চিনেছি রে, বহুদিনকার ও যে বটতলা-ছবি··
ছেলেবেলাকার হারানো কাহিনী মনে পড়ে গেল সবি !
গোপাল ভাঁড়ের কত যে কাহিনী লুকায়ে পড়েছি ভাই···
পড়েছি, হেসেছি, আজ বুড়ো হয়ে সব কথা মনে নাই !
তবু ভুলি নাই বটতলা-ছাপা কাঠে-খোদা ছবি-খান !
ছেলেবেলা ওর হাসির দমকে হয়েছি যে খান্‌-খান্ !
লাঠি ঠুকে ঠুকে সেই বুড়ো আজ এলো যে ঘরের মাঝে,
হেসে বলে "ভাই; আমারে ভুলেছ আজি অকাজের কাজে !
বাঙলা দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাকে ডেকে কই
তোদের সবার মুখে-চোখে আজ প্রাণখোলা হাসি কৈ ?

স্বপনবুড়োর ঝুলি

অকালপক্ক তোরা যে সবাই এ কি রে মুখের ছিরি।
কঙ্কালসার চেহারা দেখে যে মোর মন করে রি-রি!
পেট ভরে তোরা খাবি সবে আর হাসিবি মনের সুখে—
নুয়ে পড়া যত দেহ দেখে ভাই ধাক্কা লাগিছে বুকে!
বাঙলা দেশের একি দুর্গতি ? হাসিটুকু গেল ক্ষয়ে···
বাঁচার নামেই ধুকিছে মানুষ, মরিতেছে রয়ে রয়ে!"
কহিলাম তারে, "হে গোপাল ভাঁড়, কতটুকু জানো ভাই ?
তোমার দেখা সে সোনার বাঙলা আজ আর বেঁচে নাই।
দুধে-ভাতে সব থাকিত বাঙালী, ঘি-ভাতে নধর দেহ
পালা-পার্বণে হাসি ছিল মুখে, তারা বেঁচে নাই কেহ!
গোলাভরা ধান, পুকুরের মাছ, বাগানের মিঠা ফল
ভাগাভাগি করে নিয়ে গেছে আজ নয়া-রাজনীতি দল।
তাই বাঙলার সানাইয়ে কেবল কান্নার সুর শুনি···
নতুন করিয়া হাসির হল্লা জাগাইয়া তোলো গুণি!
তোমার ভুঁড়িতে আছে রসিকতা, পেটে আছে কৌতুক···
তার ছিটে-ফোটা ছড়াও, তা হলে ভরিবে বাঙালী বুক।
হাজার রকম কচ্‌কচি মাঝে পরাণ বাঁচেনা ভাই,
অনাবিল হাসি, রসিকতা টুকু আবার যে পেতে চাই!
বাঙলার ঘরে আসরে-আসরে জাগাইয়া তোলো হাসি···
তবেই বাঙালী বাঁচিবে আবার সবাকারে ভালোবাসি।"

পূজোর চিঠি

শরৎ কালের নীল গগনে চল্‌ছে যেমন মেঘ,
নৌকো আমার নদীর জলে পেয়েছে সেই বেগ !
হেথায়-সেথায় শাপলা-কমল রয়েছে ভাই ফুটে
মৌমাছি আর ভ্রমর দলে নিচ্ছে মধু লুটে !
কাশের বনে ডাক দিয়ে যায়, বইছে মধুর হাওয়া
নদীর জলে নৌকো পরে চল্‌ছে মোদের গাওয়া।
শরৎ কালের সবুজ শোভা দেখ্‌বি কেরে আয়
হাল্‌কা বায়ে বৈঠা ঘায়ে নৌকা চলে যায়।
তীরে যদি দুঃখ আছে,—হেথায় আছে প্রীতি
সকল জনে বাসতে ভালো পরাণ জাগে নিতি।
পায়নি কেবা পূজোর কাপড়—কাঁদ্‌ছে একা ঘরে
নৌকো মাঝে প্রীতির রাখী আছে তাহার তরে।
আপন জনে হারিয়ে কাহার চক্ষে বহে জল ?
নৌকো মাঝে ঠাঁই করে নে, দল বেঁধে ভাই চল !
জীবন পথে চল্‌তে গিয়ে হোঁচট্‌ খেলো কেবা ?
তরণীতে আয়না উঠে—আছে মধুর সেবা।
শিশু-কিশোর, দল বেঁধে আয়, আছে উজল হাসি—
চঞ্চলতার বৈঠা মোরা চালাই বারোমাসই !

স্বপনবুড়োর ঝুলি

দুঃখ, বেদন, বিফলতা আয় না তীরে ছাড়ি
মন-পবনের নৌকো খানি নেরে সবাই কাড়ি!
মৃত্যু যদি তীরে তোদের,—জীবন পাবি না'য়ে
হার মেনে ভাই অলসতা পালায় প্রাণের দায়ে!
স্বপনবুড়োর সওদা আছে নৌকো ভরা সুখ
তারই লাগি শিশু-কিশোর হল যে উৎসুক!
তাইত ডাকি—দলে দলে নৌকোতে ভাই আয়
শারদীয়ার সব উপহার আছে যে এই নায়।

পুরীর চিঠি

পুরীর সাগর-সৈকতে বসি বোশেখী-পূর্ণিমায়
তোমাদের কাছে পত্র লিখিতে জ্যোছনায় প্রাণ চায়।
রূপা-গলা ঢল চলে অবিরল কোথা নেই তার শেষ,
মনে প্রাণে শুধু ঝঙ্কারি ওঠে নন্দন-বীণা-রেশ!
চাঁদের জোছনা সাগরের জলে কি কথা যায় গো লিখে
সে কাহিনী যদি পড়িবারে চাও, নব-ভাষা নাও শিখে!
ঝোড়ো হাওয়া শুধু এলোমেলো বয়, ঝিকিমিকি করে আলো,
সাগরে-সমীরে-জোছনায় ঘিরে সবই যেন লাগে ভালো।
জন্ম নিলেন আজিকার দিনে তথাগত ভগবান—
এইদিনে হল সিদ্ধিলাভ আর এই দিনে নির্বাণ!

স্বপনবুড়োর ঝুলি

"শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার" আছে পবিত্র পুরীধামে—
আমরা সবাই মিলিলাম সেথা বুদ্ধ-পুণ্য-নামে !
স্বর্গদ্বারে সমুদ্রতীরে "ভারত সেবাশ্রম"
এই ভবনের তেতালার ঘর তারও মায়া নয় কম !
হেথা স্বামীজীর আতিথ্য লভি বাঁধিনু ক্ষণিক বাসা,
মধু সমীরণ বয় সারাখণ, আমরাও ছিনু খাসা !
জগন্নাথের বিগ্রহ যদি দেখিতে বাসনা মনে,
প্রণতি জানাও যতেক দেবতা প্রদক্ষিণের সনে।
সত্যনারায়ণের পাশেই আছে অক্ষয় বট—
তারই ছায়াতলে বসাও যাত্রী মন-মঙ্গল-ঘট !
রোহিণীকুণ্ড, বিমলারে দেখি—হেরিও গোষ্ঠলীলা,
সাক্ষীগোপাল, গণেশে নমিও—সবে যে সিদ্ধি দিলা !
সরস্বতী ও সাবিত্রী দেবী…নমিও সত্যভামা,
বিশ্বকর্মা ছাড়ায়ে রয়েছে ভদ্রকালী সে বামা !
মহালক্ষ্মীর পদধূলি নিয়ে দুয়ারে বসিও ভাই,
এই মহাদেবী তুষ্ট থাকুন, বর নাও তাঁর ঠাঁই !
পাতালপুরীর মহাদেব আর সূর্য সে নারায়ণ
প্রণাম করিলে,—মণিকোঠা তব হরণ করিবে মন !
অরুণ স্তম্ভ, গরুড় স্তম্ভ করিয়া প্রদক্ষিণ
স্নান-বেদীতলে পূত মনখানি করিয়া দাও বিলীন !
সুভদ্রা আর বলরাম সাথে আছেন জগন্নাথ—
পবিত্র তব পরাণ লইয়া কর তাঁরে প্রণিপাত !

স্বপনবুড়োর ঝুলি

দেবতারে দেখি প্রফুল্ল মনে প্রসাদ লইও হাতে—
নীলাকাশ তলে রূপালী জোছনা আশিস জানাবে মাথে।
সারা পুরী জুড়ে এখানে-ওখানে আছে যে পুণ্য ঠাঁই
সে সব যদি না দেখ হে যাত্রী, মনে ত' শান্তি নাই !
যেখানে গোপনে সাধনা করিত যবন সে হরিদাস,
"সিদ্ধ বকুল" রয়েছে দাঁড়ায়ে সেইখানে বারো মাস।
রাধাকান্তের মঠের মাঝারে চৈতন্যের ঘর—
সাধুর পাতুকা, জীর্ণকন্থা আপন করেছে পর।
শ্বেত গঙ্গার মিলন হয়েছে আদি গঙ্গার সাথে
পুণ্য সে বারি অঞ্জলি ভরি নিও গো পথিক মাথে।
সার্বভৌম বাসুদেব হেথা জ্বেলেছে জ্ঞানের আলো,
জীর্ণ ভবন কাঁদিছে আজিকে, তবু যে লাগিল ভালো।
মার্কেণ্ডেয় সরোবর দেখি—নরেন্দ্র সরোবর
নৌকার পরে জগন্নাথ যে বাঁধে তু'দিনের ঘর।
সেই সে শীতল সরোবর তীরে বিজয়কৃষ্ণ ধাম
এই আশ্রমে বিশ্রাম করি শান্তি ত' লভিলাম।
তাঁহার যোগ্য শিষ্য যে ভাই কুলদা ব্রহ্মচারী
পুণ্য ভবন দাঁড়ায়ে আজিও গাহে জয় গান তারই !
আঠারো নালার করুণ-কাহিনী শুনিও পথিক পথে,
তু'নয়ন ভরি অশ্রু আসিবে, থামিবে না কোনো মতে !
মাসীর বাড়ির পিঠের লোভেই জগন্নাথের আসা,
এই নিরিবিলি ধাম তব ভাই লাগিবে বড়ই খাসা।

স্বপনবুড়োর ঝুলি

শ্রীচৈতন্য-বিষ্ণুপ্রিয়ার চরণ-যুগল-ছাপ -
পরশ করিয়া তোমার মনের ঘুচিবে মনস্তাপ !
ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর হেরি—যাও যদি সোজা চলে—
"সোনার গৌরাঙ্গ" তোমারে ভোলাবে কতই ছলে !
বীর হনুমান সমুদ্রতীরে হল যে প্রহরী নিজে,
পুণ্য সে ধাম চক্রতীর্থে মনে জাগে কত কী যে !
ভাবত প্রদক্ষিণেব পথেই শঙ্কর মঠ গড়ে
পাতাল পুরীতে আপনার হাতে শিব প্রতিষ্ঠা করে।
সব দেখা-শোনা শেষ করে ভাই নামিও সাগর জলে··
ঢেউয়ের দোলায় ভাসে তনু-মন কী বিপুল কুতূহলে
জীবনেব যত পাপ-তাপ-শোক সমুদ্র নেবে মুছে
জাগিবে পরাণ নব-গৌরবে, দুঃখ যাইবে ঘুচে।
তাইত তোদের আশিস জানাই সমুদ্র তটে বসি—
হেথায় আসিয়া টানিবি সবাই জগন্নাথের রশি !

বিজয়ার চিঠি

কাছে ও দূরের সোনার কাঠিবা, যে যেখানে সবে আছো-
জানি জানি ভাই, উৎসব দিনে খালি প্রাণ খুলে নাচো।
এখনো ঢাকের আওযাজ থামে নি, সানায়েব সুব শুনি—
কেবা কয় শত প্রতিমা দেখিলে—তাই বসে বসে গুনি !
কেউ বা শান্ত, কেউ বা চপল, গম্ভীর কেউ আছো- -
বিজয়ার দিনে ডেকে কই সবে,- শতেক বছর বাঁচো।
তোদেব জানাই বিজয়ার প্রীতি, কোলাকুলি, ভালোবাসা।
তোদের নিকটে অনেক যে পাবো, স্বপনবুড়োর আশা !
মহাভারতের সন্তান তোরা, কেউ ছেলে কেউ মেয়ে —
নতুন করিয়া ওঠ্ সবে আজি জাগরণী গান গেয়ে।
বিজয়ার প্রীতি, ভালোবাসা আর মধুর আলিঙ্গন—
সব ব্যথা গ্লানি দূর করে দিয়ে পুলকিত হবে মন।
তোমাদের দেয়া প্রীতির রাখীটি কত না পরেছি হাতে - -
তোমাদের গাঁথা মালা গলে পরি—হৃদি আনন্দে মাতে।
তোমাদের প্রীতি, তোমাদের গীতি, ক্ষণিক মধুর হাস্--
আনন্দে রাখে মনখানি মোর, সুখে থাকি বারো মাস।
কত রকমের অনুরোধ আসে, মজাদারী নাম চাই···
হিমসিম্ খেয়ে গেলাম বন্ধু, তালিকা শূন্য তাই !
কত ফুল দেছ হাতে তুলে ভাই, দিয়েছ যে নব প্রীতি
স্বপনবুড়োর জীবনে তাহাই—নিত্যি শোনায় গীতি।

স্বপনবুড়োর ঝুলি

দেশে দেশে দেখি খালি হাসি মুখ, শুনি শুধু কলরব,
তোদের জীবনে যেন না ফুরায় মধুর এ উৎসব !
বিজয়ার দিনে ভাই-বোন সবে, বিজয়ের কথা কই—
মনে মনে ভাবো, "আমরা বিরাট, আমরা ত' ছোট নই।"
মহাভারতের ছেলে মেয়ে তোরা, বিরাট তোদের মন—
তোরা বড় হবি—এই কথা ভেবে হিমালয় জেগে রন্।
গঙ্গা তোদের হৃদি-স্পন্দন, বিন্ধ্য তোদের আশা,
ভারত-সাগর-কল-কল্লোলে শুনি যে তোদের ভাষা !
যে যেখানে তোরা আছিস ছড়ায়ে, তোরা যে আপন ধন !
তোরাই মোদের ঈশের আশিস্—এই কথা বলে মন।
কটু কথা যদি কয়ে থাকি কারে, রেখোনা মনের মাঝে
তোদের মধুর হাসি-গীতি-কথা নিয়ত হৃদয়ে রাজে !
কাছে ডেকে সবে শুধাই কুশল, মাথে রাখি শুধু হাত
তোদের জীবনে জাগুক অরুণ, দূর হোক কালো রাত।
প্রণাম জানায়ো গুরুজন পদে, শিক্ষক কাছে নতি—
বিপদে ধৈর্য হারায়োনা কভু, ভগবানে থাক্ মতি।
তোমাদের যত যশ-সৌরভে ভরুক ভারত ভূমি--
হৃদয় সবার মাতিয়া উঠুক তোমাদের মুখ চুমি।
দোষ যদি কিছু করে থাকো ভাই, ক্ষমা চেয়ে নিও হেসে—
তোদের মুখেই নিজে ভগবান জেগেছেন ভালবেসে।
শারদীয়া দিনে মধু-অবকাশে সবে ভালো থাকো ভাই,
স্বপনবুড়োর এ ছাড়া জীবনে অন্য কামনা নাই।

বর্ষার চিঠি

আষাঢ় মাসের বৃষ্টি ঝরে টিপির টিপির ভাই—
আজকে আমার বাইরে যাবার কোনো তাড়াই নাই!
আয় না সবে আসর বসাই ছোট্ট কোণের ঘরে,
সবাই মিলে বোস না ঘেঁষে,—বৃষ্টি কেবল ঝরে!
পটলি মাসি, দে আমাদের ঝাল ছোলা আর আদা,
গ্রামোফোনে রেকর্ড চড়া—বকে বকুক দাদা!
সব-ভুতুড়ে গল্প বলো ঠাকুরদাদা এসে—
তুলবো তবে ওই পাকা চুল আমরা ভালোবেসে!
না হয় তোরা কাগজেরই নৌকো ভাসা জলে,
বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর—দেখ্‌বো কুতূহলে!
অঙ্ক-কষা আজ তোলা থাক্, গর্জে যে ভাই বাজ,
নৌকো আমার পথ হারালো সাত সাগরের মাঝ!
ঝোড়ো হাওয়ায় কোথায় চলে পক্ষীরাজের ঘোড়া?
এখনো কি চুপ্‌টি করে থাক্‌বি বসে তোরা?
তার চেয়ে আয় বৃষ্টি জলে খুব করে ভাই ভিজি
গলির মোড়ে সাঁতার কাটি সবাই মিছিমিছি!
ডিগ্‌বাজি খাই, কেবল লাফাই, চিৎ-সাঁতারে ভাসি—
জান্‌লা থেকে যতই চ্যাঁচান জ্যাঠামশাই আসি!

স্বপনবুড়োর ঝুলি

তর্‌তরে ওই জলের স্রোতে সরপুঁটি ভাই ধরি,
এক সাথে আয়, সবাই মিলে বর্ষারই গান করি !
না হয় তোরা ক্ষ্যান্ত পিসির কানে কানে বল
চাই খিচুড়ি, ইলিশ ভাজা, মান্‌বো নাকো ছল !
সার দিয়ে সব পাশাপাশি বসি বারান্দায়—
তপ্ত খিচুড়ীটা যে ভাই সবাই খেতে চায় !
না হয় চলো রথের দিনে বাজাই ভেঁপু বাঁশী,
গরম গরম পাঁপড় ভাজা বৌদি ভাজুক আসি !
হাঁক্‌চে যে মেঘ, ঢাল্‌ছে যে জল, ডাক্‌ছে ব্যাঙের দল,
না হয় কদম বনে গিয়ে গাঁথবি মালা চল !
বনের পথে মেঘের ডাকে নৃত্য করে শিখি,
ক্ষণপ্রভা গগন-কোণে চল্‌ছে চিঠি লিখি !
এমন দিনে আসব মাঝে কাব্য পড়ি শোন
টাপুর-টুপুর বৃষ্টি ধারায় আকুল হল মন !

পথ চলার গান

এম্‌নি করেই পায়ে-পায়ে পথ চলি—
বিঘ্ন-বাধা যাবো রে ভাই সব দলি।
উঠুক রে ঝড় জাগুক তুফান
অগ্রগতির গাইবো রে গান
মাথার উপর আকাশ ভাঙে, গাঙ্‌ ডাকে ভাই ছল্‌ছলি
এম্‌নি করেই পথ চলি।

জোয়ার জলের তালে-তালে ভাসিয়ে দেবো নাও
শক্ত হাতে হাল ধরেছি,—যতই আসুক বাও!
অমানিশার রাত্রি শেষে
উঠ্‌বে অরুণ মধুর হেসে
পথের নেশায় উচ্চ-আশা জাগ্‌ছে মনে চঞ্চলি --
এম্‌নি করেই পথ চলি।

আলোচনার আসর

ফুল ফোটানোর খেলা

বসন্তের বৃক্ষ যেমন অজস্র ফুল ফোটায় আর ফল ধরায়— একবার তাকিয়েও দেখে না সে ফুল মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল কিনা, কেউ তাতে মালা গাঁথল কিনা, অথবা কেউ সে ফুল দুপায়ে মাড়িয়ে গেল কিনা!

গাছের আনন্দ সে ফুল ফুটিয়েই খুশী। সে ফুলে পূজার অর্ঘ্য রচিত হল কিংবা অবহেলায় ছড়িয়ে রইল পথের ধুলোয়, গাছ তা নিয়ে মাথা ঘামায় না! ফুল ফোটানোর যে আনন্দ, গাছ তাই পুরোপুরি উপভোগ করে। তার বেশী সে কিছু আশা করে না। অজস্র ফুল সে উড়িয়ে, ছড়িয়ে, বিলিয়ে দিয়ে যায়। যার গরজ, সে কুড়িয়ে নিক্ আঁচল ভরে! খোঁপায় গুঁজুক, কিংবা প্রিয়জনের জন্যে মালা গাঁথুক।

এই ফুল ফোটানোর আনন্দ…আর পুলক কবিরা যেমন হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন এমন আর কেউ নয়।

রবীন্দ্রনাথ ছোটদের জন্যে এমনি অজস্র ফুল ফুটিয়ে গেছেন। যারা রসিক তারা সেই পথে এসে দুদণ্ড থম্‌কে দাঁড়ায়, ফুলের শোভা দেখে অবাক হয়, সুবাসে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। সেই ফুল তুলে ফুল্ল মনে ধরে ফিরে যায়। সেই ফুল ফোটানোর নমুনা দেখলে বিস্ময়ের আর পরিসীমা থাকে না! কত ধরণের ফুল! কত তার রঙের বাহার!

স্বপনবুড়োর ঝুলি

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন ২৫শে বৈশাখকে স্মরণ করে কয়েকটি বিচিত্র ফুল ছোটদের খেলাঘরে এনে তুলে ধরছি। আশা করি, ফুলগুলির মধুর সুবাস, আর রঙের বাহার দেশের ছেলেমেয়েদের আসরে আনন্দের প্রস্রবণ বইয়ে দেবে।

অজস্র ছড়া লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ছোটদের আনন্দ দিতে। একটা নমুনা শোনাই—

টুক্‌রো বাসন চিনেমাটির
মুড়ো ঝাঁটা খড়কে কাঠির
নল্‌চে-ভাঙা হুঁকো, পোড়াকাঠটা,
ঠিকানা নেই আগুপিছুর
কিছুর সঙ্গে যোগ না কিছুর,
ক্ষণকালের ভোজবাজির এই ঠাট্টা॥"

রাজকন্যা-রাজপুত্তুরের রূপকথা তোমরা ঠাকুমা-দিদিমার মুখে ত কতই শুনেছ! কিন্তু তাদের নিয়ে এমন মজাদার উদ্ভট ছড়া কখনো শুনেছ কি? একটা নমুনা শোনো-

—"কাঁচড়াপাড়াতে এক
ছিল রাজপুত্তুর
রাজকন্যারে লিখে
পায় না সে উত্তর!
টিকিটের দাম দিয়ে
রাজ্য বিকাবে কি এ
রেগে-মেগে শেষ কালে
বলে ওঠে—ছুত্তোর!

ডাক বাবুটিকে দিল

মুখে ডালকুত্তোর ॥"

পাঠশালায় তোমরা ত' অনেকেই পড়ো। কিন্তু এ রকম পড়ুয়ার সন্ধান পেয়েছ কি কখনো?

"পাঠশালে হাই তোলে

মতিলাল নন্দী

বলে "পাঠ এগোয় না

যত কেন মন দি।"

শেষকালে একদিন গেল চড়ি টঙ্গায়.

পাতাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে ভাসালো মা গঙ্গায়

সমাস এগিয়ে গেল,

ভেসে গেল সন্ধি

পাঠ এগোবার তরে

এই তার ফন্দি ॥"

আজকাল আমরা অনেক কাজের মেয়ের সন্ধান পাই। তারা হাতে কাজ করে আর মুখে অনর্গল কথা বলে। কিন্তু এমন পাঁচ বোনের সন্ধান কোথাও কি মিলেছে?

"ক্ষান্তবুড়ির দিদি শাশুড়ির

পাঁচ বোন থাকে কাল্‌নায় -

সাড়িগুলো তারা উনুনে বিছায়

হাঁড়িগুলো রাখে আল্‌নায়

কোনো দোষ পাছে ধরে নিন্দুকে

নিজে থাকে তারা লোহা-সিন্ধুকে.

স্বপনবুড়োর ঝুলি

টাকা কড়ি গুলো হাওয়া খাবে বলে
রেখে দেয় খোলা জাল্‌নায়.
নুন দিয়ে তারা ছাঁচি পান সাজে,
চুন দেয় তারা ডাল্‌নায় ॥”

মেয়েদের গয়না পরার কত ফ্যাসান প্রচলিত আছে—সেই আদি যুগে থেকে। কিন্তু কোন্ বিয়ের কনে কানের এমন অপরূপ গয়না পরেছিল সেটা তোমরা খোঁজ নিয়ে দেখতে পারো

“দু কানে ফুটিয়ে দিয়ে
কাঁক্‌ড়ার দাঁড়া
বর বলে, কান দুটো
ধীরে ধীরে নাড়া।
বউ দেখে আয়নায়,
জাপানে কি চায়নার
হাজার হাজার আছে
মেছনীব পাড়া
কোথাও ঘটে নি কানে
এত বড় ফাঁড়া !”

শীতের দিনে ঠাণ্ডার দাপটে তোমরা ত' অনেকেই মোজা পরো। কিন্তু সেই মোজা পরার এমন মজাদার 'ছড়া হতে পারে—সে কথা কেউ ভেবেছ কি ?

“মুচ্‌কে হাসে অতুল খুড়ো
কানে কলম গোঁজা

চোখ টিপে সে বললে হঠাৎ

পরতে হবে মোজা !

হাসল ভজা হাসল নবাই

ভারী মজা, ভাব্‌ল সবাই

ঘর শুদ্ধ উঠ্‌ল হেসে

কারণ যায় না বোঝা ॥"

আজকের যুগের ছেলেরা ত' বিজ্ঞান-ধর্মী। তারা সব কিছুই বিজ্ঞানের ভেতর দিয়ে দেখ্‌তে শেখে। খাদ্যের ভেতর ভিটামিন আছে কিনা, সেটা যাচাই করে তবে খাবার খেতে হবে। কিন্তু ভিটামিনের এমন মজাদার ছড়া—তাও একটুখানি তোমরা চেখে নাও—

"ঘাসে আছে ভিটামিন, গোরু ভেড়া অশ্ব

ঘাস খেয়ে বেঁচে আছে, আঁখি মেলে পশ্য।

অনুকূলবাবু বলে, ঘাস খাওয়া ধরা চাই,

কিছুদিন জঠরেতে অভ্যেস করা চাই :

বৃথাই খরচ করে চাষ করা শস্য ॥"

তবে আর কি ? এই ছড়ার ভেতর দিয়েই ত' খাদ্য-সমস্যার সমাধান হয়ে গেল ! আমাদের খাদ্য-মন্ত্রীও হাঁফ্‌ ছেড়ে বাঁচলেন।

কিন্তু ছড়ার শেষ অংশটা আরো মজাদার—

"দুদিন না যেতে যেতে মারা গেল লোকটা,

বিজ্ঞানে বিঁধে আছে এই মহাশোকটা,

বাঁচলে প্রমাণ শেষ হোত যে অবশ্য ॥"

স্বপনবুড়োর ঝুলি

আমাদের বাঙলা দেশের সমাজে নানা রকম ঠাট্টার প্রচলন আছে। ঠাকুর্দা-নাতিতে ঠাট্টা আছে, জামাইবাবুর সঙ্গে শ্যালিকার ঠাট্টা আছে, বন্ধুতে-বন্ধুতে ঠাট্টা আছে, বিয়ের বাসরে এয়োদের ঠাট্টা ত' চিরকালের চল্‌তি। কিন্তু সবার ওপর টেক্কা দিয়েছে বরের অভিনব সাঙ্ঘাতিক ঠাট্টা !

সেই ঠাট্টার নমুনাটা তোমরা একটু শোনো—

"বর এসেছে বীরের ছাঁদে
বিয়ের লগ্ন আটটা।
পিতল-আঁটা লাঠি কাঁধে,
গালেতে গালপাট্টা।
শ্যালীর সঙ্গে ক্রমে ক্রমে
আলাপ যখন উঠল জমে
রায়বেঁশে নাচ নাচের ঝোঁকে
মাথায় মারলে গাঁট্টা।
শ্বশুর কাঁদে মেয়ের শোকে,
বর হেসে কয় ঠাট্টা।"

তোমরা ত' নিজেরা মাঝে মাঝে বন-ভোজনের আয়োজন করে থাকো। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কৌতুক-ছড়ার ভেতর দিয়ে কি রকম নিমন্ত্রণের ঘটা দেখিয়েছেন—সেটা ইচ্ছে করলেই তোমরা মুখস্থ করে রাখ্‌তে পারো —

"রান্নার সব ঠিক
পেয়েছি ত' নুনটা
অল্প অভাব আছে
পাইনি বেগুনটা।

পরিবেষণের তরে
মোরা আছি সব ভাই,
যাদের আসার কথা
অনাগত সববাই।
পান পেলে পুরো হয়
জুটিয়েছি চুনটা -
একটু-আধটু বাকি
নাই তাহে কুণ্ঠা!"

এমন মজাদার ভোজ তোমরা দেখেছ কখনো?

তোমরা যারা পাড়াগাঁয়ে থাকো—বর্ষাকালে ডোবার ধারে কত কোলা ব্যাঙ দেখ! তাদের গ্যাঙোর-গাঙ্ শব্দও তোমাদের কানে যায়! কিন্তু সেই কোলা ব্যাঙ নিয়ে কেমন মজাদার ছড়া তৈরী হতে পারে—শুনেই দেখ না!

"ভূত হয়ে দেখা দিল
বড়ো কোলা ব্যাঙ
এক পা টেবিলে রাখে
কাঁধে এক ঠ্যাঙ!
বনমালী খুড়ো বলে -
রুবো মোরে বক্ষে,
শীতল দেহটি তব
ফুলিয়ো না বক্ষে;
উত্তর দেয় না সে,
বলে শুধু—ক্যাঙ"

স্বপনবুড়োর ঝুলি

তোমরা হয়ত লক্ষ্য করেছ যে, ডাক্তাররা অনেক সময় এমন 'প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন্' লেখেন, যা হাজার চেষ্টা করেও পড়া যায় না! তা নিয়েও রবীন্দ্রনাথ কেমন সুন্দর রসিকতা করে ছড়া লিখেছেন! সবাই মুখে-মুখে বলো, সন্ধ্যাবেলার আসর দিব্যি জমে যাবে—

"পাড়াতে এসেছে এক
নাড়ি-টেপা ডাক্তার
দূর থেকে দেখা যায়
অতি উঁচু নাক তার।
নাম লেখে ওষুধের
এ দেশের পণ্ডদের
সাধ্য কী পড়ে তাহা,
এই বড়ো জাঁক তার।"

এই ভাবে রবীন্দ্রনাথ কত ভাবে ছন্দ আর মিল নিয়ে ফুল ফোটানোর খেলা খেলেছেন ছোটদের আনন্দ দেবার জন্যে। আমি শুধু তোমাদের গোটা কয়েক নমুনা দেখিয়ে দিলাম।

তবে আমার আশা রইল,--কবি যে মণি-মঞ্জুষা তোমাদের জন্যে সঞ্চয় করে গেছেন -তার চাবিকাঠি তোমরা একদিন খুঁজে পাবে।—তখন কাব্য-রসের ভাণ্ড নিয়ে যে মানসিক-ভোজের আয়োজন হবে, তার তুলনা মেলা শক্ত!

যে এখনো বিদ্যালয়ে যায় না

—যে ছেলে-মেয়ে এখনো বিদ্যালয়ে যেতে সুরু করেনি, তাকে আমরা মুখে-মুখে কিভাবে শিক্ষা দিতে পারি —ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে সেই কথা জানাতে হবে।

বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে সহজ মনে হলেও কাজটি অত্যন্ত শক্ত, ছোট ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে যাঁরা হামেশা মেলামশা করেন, আশা করি তাঁরা এর গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন।

আদর্শ ও চিন্তাধারার দিক থেকে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, মন্তেসরি-শিক্ষাপদ্ধতিতে ও রবীন্দ্রনাথের "শান্তিনিকেতনে" প্রকৃতির মধ্যে মেলামেশা আর গল্প শোনার আনন্দ দান কেউ কারও অনুসরণ না হলেও শিক্ষাপদ্ধতি এক ও অভিন্ন।

যে ছেলে বা মেয়ে এখনও বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে পুঁথিগত বিদ্যা আয়ত্ত করতে সুরু করেনি, তার মনটা হালকা হাওয়ার মতই অবারিত আর সুদূরপ্রসারী। নতুন মন আর নতুন চোখ নিয়ে সে সারা বিশ্বকে দেখে বেড়াচ্ছে। তাই যা-কিছু দেখে, যা-কিছু শোনে, সব তাতেই সে অকারণ খুসিতে ঝলমল করে ওঠে।

এইজাতীয় প্রাণ-স্পন্দনে উচ্ছল ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে যাঁদের মিতালী পাতাবার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁরা জানেন যে, পুঁথিকে দূরে সরিয়ে রেখে কত সুন্দর ভাবেই না তাদের মনকে জয় করে নেওয়া চলে।